মল্লিকা

বিমল কর

কথাকলি
১ পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা ৯



প্রথম সংস্করণ : মহালয়া ১৩৬৭

প্রকাশক :

প্রকাশচন্দ্র সিংহ

১ পঞ্চানন ঘোষ লেন

কলিকাতা ৯

মুদ্রাকর :

সত্যেন্দ্রনাথ চৌধুরী

দাস প্রেস

৫২ ভূপেন্দ্র বোস এভিনিউ

কলিকাতা ৪

প্রচ্ছদ :

সুবোধ দাশগুপ্ত

প্রচ্ছদ মুদ্রণ :

ফাইন প্রিণ্টার্স প্রাইভেট লিঃ

বাঁধাই :

নিউ বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

পরিবেশক :

ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিঃ

২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট

কলিকাতা ১২

দাম তিন টাকা

বাণী-কে

দাদাভাই

পূর্বকথা

ছেলেবেলায় আমার প্রজাপতি ধরার শখ ছিল না। সন্তুর ছিল। আমাদের ধানবাদে, তেঁতুলপাড়ায়, তখন বিস্তর মাঠ ঘাস বুনো-ঝোপ লতাপাতা আর রোদ। প্রজাপতি আসত। আমাদের সন্তু অনেকটা পানফলের মতন যার মুখ, ছোট ছোট হাত পা, বাসি হলুদের মতন গায়ের রঙ, এক মাথা চুল, পরনে খাকি হাফ প্যাণ্ট—সেই সন্তু প্রজাপতি ধরার ওস্তাদ ছিল। ঠিক মনে নেই কোন সময়টায়—তবে বর্ষার শেষে বোধ হয়; কিংবা শীতে শীতে প্রজাপতিরা যেন ঝাঁক বেঁধে আসত। সন্তুর আর সব তখন মাথায় উঠত। সারাদিনই সে প্রজাপতি ধরছে। তার বাবা, ক্ষিতীশ জ্যেঠামশাই, রেলে কি কাজ করতেন আজ আর মনে পড়ছে না। তবে নীল নীল গোটানো কাগজে জ্যামিতির মতন কত যে ছবি আঁকতেন তার ইয়ত্তা নেই। সন্তু তার বাবার কাছ থেকে সেই নীল কাগজ জুটিয়ে নিত। আর আকাশের চেয়েও বেশি নীল, গাঢ় নীল কাগজে তার যত প্রজাপতি গেঁথে রাখত, আলপিন দিয়ে। সন্তু যে-ভাবে চাইত, যত চাইত, তত প্রজাপতি রাখতে পারত না। কোনোটা নষ্ট হত, কোনোটা শুকিয়ে যেত, খুলে পড়ে যেত, লাল পিঁপড়েতে ছেয়ে যেত; সন্তুর মা রাগ করে সেই জঞ্জাল ফেলে দিত কত, তবু সন্তুর প্রজাপতির চিড়িয়াখানা কিছু কম ছিল না। চিড়িয়াখানা বললাম, কেন না সন্তু নিজেই বলত, ওটা তার প্রজাপতির চিড়িয়াখানা।

এই প্রজাপতি ধরা, আলপিন দিয়ে মোটা নীল কাগজে গেঁথে রাখা আমার ভাল লাগত না। প্রজাপতি ডাকটিকিট নয়। ধীরুদা যেমন ডাকটিকিট জমিয়ে রাখে, বিজন যত রাজ্যের ঘুড়ি আর

মার্বেল, আমি গাদা গাদা ছবি—সন্তু তেমনি প্রজাপতি জমায়। কিন্তু ছবি ঘুড়ি মার্বেল ডাকটিকিট আর প্রজাপতি এক নয়।… সন্তুর ওপর মাঝে মাঝে আমার ভীষণ রাগ হত, ঘেন্না হত ; আমরা বলাবলি করতাম সন্তুটা নিষ্ঠুর। কত বার সন্তুকে বলেছি : তুই প্রজাপতি মারিস না, কীট-পতঙ্গদের মারতে নেই, প্রজাপতি মারা পাপ…। সন্তু তার গোল গোল ঝকঝকে চোখ ঝলসে হাসত ; বলত, 'পাপ না কচু। তুই বোলতা মারিস না, ডেঁউ পিঁপড়ে মারিস না, তবে—? প্রজাপতি দেখতে সুন্দর। বল, সুন্দর কিনা?' সন্তু আমায় যেন সায় দিতে একটু সময় দিত, তারপর নিজেই বলত, 'সুন্দর বলেই না সাজিয়ে রাখি।' সন্তুর কথার জবাব আমি জানতাম না। তার কথা কাটতে না পেরে বরং মনে হত, ও ঠিক বলেছে। তবু সন্তুর প্রজাপতি ধরা, প্রজাপতি গেঁথে রাখা আমার ভাল লাগত না।

আমাদের সেই ছেলেবেলায়, হয়ত সব মানুষেরই ছেলেবেলায়, এই যার যা ভাল লাগে, মনে ধরে তেমন কিছু জমিয়ে রাখার একটা নেশা থাকে। সে-বয়সে মনে মনে কিছু জমানো যায় না ; তাই চোখে পড়ে এমন কিছু জমানো। এতে আমাদের অনেক গর্ব, ভীষণ সুখ। আমার কাছে এই জিনিসটা এত আছে, তোর নেই। জিনিসটা যেন মস্ত সম্পদ।

ছেলেবেলায় আমরা ভাবতুম আমাদের এই নুড়ি চক মার্বেল ঘুড়ি ছবি, এমন কি সন্তুর প্রজাপতি—যা আমরা জমাই, জমিয়ে রাখি—সবের মধ্যেই কেমন একটা চুপি চুপি ভাব আছে। আমার জমানো ছবি যখন বন্ধুদের দেখাতাম, বেশ একটা গোপন সুখ পেতাম। বুঝতে পারতাম, বন্ধু ছাড়া—সন্তু বিশু বিজন কি হাবুল ছাড়া, আর কেউ এ-সব ছবি দেখতে পাবে না। আমি দেখাব না। একবার বাবা আমার ছবির খাতা দেখে ফেলেছিল। আমি রীতিমত ধমক এবং কানমলা খেয়েছিলাম। স্পষ্ট মনে পড়ে,

যে-ছবির জন্যে এই শাসন সে-ছবিটা ছিল মেয়ের ; সাজানো গোছানো বিছানায় একটি মেয়ে বসে আছে, ফিনফিনে কাপড়-জামা, গলায় হার, হাতে গয়না, মাথার দিকে খোলা জানলা, একটি প্রদীপ জ্বলছে একপাশে। ছবিটা আমার ভাল লেগেছিল, আমার মনে হয়েছিল, মেয়েটি উদাস চোখে মনমরা হয়ে যেন কার পথ চেয়ে বসে আছে। আমার বাবার এই ছবি ভাল লাগে নি। কেন লাগেনি, আমি বুঝতে পারি নি সেদিন ; বরং এই ভেবে অবাক হয়েছিলাম, আমার ছবির খাতায় মেয়ের ছবি আরও ত আছে, ওমরখৈয়মের ছবি, মা সরস্বতীর, বেহুলার আরও কত কিসের, ওই ছবিটা এমন কি দোষ করল !...যাক্‌গে, তারপর থেকে ছবির খাতা আমি যেখানে-সেখানে রাখতাম না, লুকিয়ে রাখতাম। ধীরুদা তার স্ট্যাম্পের খাতাটাও খুব যত্ন করে এবং লুকিয়ে রাখত, পাছে তার মেজদি টিকিট চুরি করে নেয়। বিজন তার ঘুড়ি মার্বেল কাউকে ছুঁতে দিত না। সন্তু তার প্রজাপতির চিড়িয়াখানা সবসময় আগলে রাখত, মার ভয়ে, টিকটিকি আর পিঁপড়ের ভয়ে। আমাদের বন্ধুদের মধ্যে সবাই সবার জিনিস দেখাদেখি করতাম, ভয় আশঙ্কা উদ্বেগ সন্দেহ কিছু ছিল না। হয়ত, এর কারণ এই, ছেলেবেলাতেও আমাদের মন—বড় মানুষের মনের মতনই—যার যার নিজের মতন কিছু গোপনতা রাখতে চাইত, রেখে সুখ পেত, এবং ঘনিষ্ঠদের কাছে তার ভাগ দিত।

সন্তুর প্রজাপতির চিড়িয়াখানার চেয়েও ভাল চিড়িয়াখানা অনেক পরে—এক যুগ পরে—কলকাতায় কলেজে পড়তে এসে দেখলাম। আমি যে-কলেজে পড়তুম, সে-কলেজের বায়োলজি ক্লাসের খুব নাম ডাক। জুলজি ডিপার্টমেন্টের লম্বা ঘরটায় আর-পাঁচটা চোখে-পড়া সংগ্রহের মধ্যে প্রজাপতিও ছিল। ফ্রেমে বাঁধানো ছবির মতন দেওয়ালে ঝুলত। কাঁচের ঢাকনার মধ্যে, কর্কবোর্ডে

আলপিন দিয়ে গাঁথা সার বেঁধে সাজানো প্রজাপতিগুলো দেখতে বেশ লাগত। একটু দূর থেকে, খানিকটা আলোর মধ্যে হঠাৎ চোখে পড়লে মনে হত এক ঝাঁক প্রজাপতি যেন উড়ে এসে বসেছে। এই বিভ্রম পলকের, পরমুহূর্তে সমস্ত কৃত্রিমতা রুক্ষ উগ্র উলঙ্গ হয়ে চোখের সুখ কেড়ে নিত।

সন্তুর আর আমাদের জুলজি ডিপার্টমেন্টের সাহা সাহেবের প্রজাপতি সংগ্রহের তফাতটা পরে বুঝতে পেরেছিলাম। সন্তু প্রজাপতি ভালবাসত, ভালবাসার আবেগে সে অন্ধ নিষ্ঠুর হয়ে যা পারত হাতের কাছে জড়ো করত, বোকার মতন আগলে রাখার চেষ্টায় মত্ত থাকত। প্রজাপতির সৌন্দর্যে তার মন আচ্ছন্ন ছিল। হয়ত সে মনে মনে প্রজাপতির কুয়ায় ডুবে গিয়েছিল। আর সাহা সাহেব—? সাহা সাহেব প্রজাপতি ভালবাসতেন না, প্রজা-পতির সৌন্দর্যে তিনি মুগ্ধ অন্ধ ছিলেন না। প্রজাপতির প্রতি সমস্ত কৌতূহল তাঁর পতঙ্গচর্চায় নিবদ্ধ ছিল। তিনি ছিলেন এন্‌টমোলজিস্ট।

এই কাহিনী লিখতে বসে সন্তু এবং সাহা সাহেবের কথা আমি বার বার ভেবেছি। আসলে আমার চোখের সামনে এই দুটি উদাহরণ ছিল। মল্লিকা এবং আমার কথা বলতে বসে আমি সন্তুর মতন ছেলেমানুষ হব কি হব না, তার মতন বোকা নিষ্ঠুর মুগ্ধ আচ্ছন্ন এবং আবেগময় অথবা সাহা সাহেবের মতন বিচক্ষণ মোহহীন হৃদয়হীন—এই দুইয়ের কি যে আমার হওয়া উচিত আমি অনেক ভেবেছি। শেষ পর্যন্ত মনে হয়েছে, আমাদের সেই অপরিণত অথচ আন্তরিক ভালবাসা, সেই মোহাচ্ছন্ন যৌবনের দিন মাস বছরকে সাহা সাহেবের প্রজাপতির মতন বাছাই করে সাজিয়ে-গুছিয়ে গেঁথে রাখা নিছক তালিকা বই আর কিছু হবে না। হয়ত সন্তুর মতন পাগল অন্ধ বোকা না হলে ভালবাসার—সেই বয়সের ভালবাসার কথা বলা যায় না; লেখা যায় না।

এই সন্তুকে আমি না ছেলেবেলায় ঘেন্না করতাম তার নিষ্ঠুরতার জন্যে! কে জানত একদিন আমাকেও স্মৃতির প্রজাপতি সাজাতে হবে, বোকার মতন!

২·

মল্লিকার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল পরে, অনেক পরে, কিন্তু আমি তার নাম শুনেছিলাম ছেলেবেলায়, তাকে দেখেছিলাম কৈশোরে। সেই প্রথম দেখার দিনটি আজও আমার মনে আছে। তখন শীতকাল—শীত—জানুয়ারি মাস, বিকেলটা বড় এলোমেলো, রোদের রঙ হালকা, কোলিয়ারির রাস্তায় কয়লাগুঁড়ো ধুলো উড়ছে, এক্কা চলে যাচ্ছে, দু-একটা মোটর। বড় শিশুগাছটার তলায় আমি চুপ করে দাঁড়িয়েছিলাম। আমাদের লাল-বাংলোর দিকে মুখ করে। বারান্দাটা খালি। দু-চারটে বেতের চেয়ার এদিক-ওদিক ছড়ানো। কেন জানি না, বারান্দার দিকে তাকিয়ে আমি ঠাকুরমার কথা ভাবছিলাম। মাত্র ক'দিন আগে ঠাকুমা মারা গেছে। ঠাকুমা মারা যাবার পর বারান্দাটা বড় ফাঁকা লাগে। শীতের পড়ন্ত দুপুরে বারান্দায় এসে কেউ আর রোদে বসে থাকে না, এই শেষ বিকেলে সিঁড়ির পাশে করবীগাছটার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেউ আর আমাদের খেলা দেখে না।

গেট খোলার আওয়াজে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালাম। একটি মেয়ে পা পা করে এগিয়ে আসছে। কোনও দিন দেখিনি, তবু বুঝতে পারলাম, ও মল্লিকা। সঙ্গে তাদের বাড়ির চাকর সত্যনারাণ।

মল্লিকার ফ্রকের রঙটা গোলাপের। হাঁটুর তলা পর্যন্ত ঢাকা। গায়ে ধবধবে সাদা সোয়েটার। পায়ে মোজা জুতো। টান করে বাঁধা চুল, সিঁথি দেখতে পাচ্ছিলাম না।

গোলগাল, ফরসা—খুব ফরসা, যেন কাচকড়ার বড় পুতুলের মতন দেখাচ্ছিল ওকে। নিম গাছের ছায়া পেরিয়ে শীতের মরা রোদ দিয়ে ও এগিয়ে আসছিল; সামান্য আড়ষ্ট। আমার পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে একটু থেমে শুধলো, 'কাজল কোথায়?'

'জানি না।' নিতান্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললাম। মল্লিকা এগিয়ে গেল।

আমার ছোট্ট জবাবে আমি মনে মনে খুশি হয়েছিলাম। তাচ্ছিল্য, অবজ্ঞা, নিজের মর্যাদা—সবই যেন এই জবাবের মধ্যে ছিল। কেন যে হঠাৎ নিজেকে আমি মল্লিকার চেয়ে উঁচুতে বসাতে চেয়েছিলাম জানি না। হয়ত বয়সের জন্যে, হয়ত তখন আমার ম্যাট্রিক ক্লাস বলেই। আমি তখন ষোলো; একটু লম্বা, বড় বহরের ধুতি এবং চোখে চশমা পরি। তা ছাড়া ম্যাট্রিক ক্লাস…। ও আমার খুড়তুতো ছোট বোনের বন্ধু বলেও বোধ হয় কিছুটা রাশভারি হওয়া আমার উচিত বলে মনে করেছিলাম।

কিন্তু মল্লিকাকে আমার ভাল লেগেছিল। অমন সুন্দর রঙ আমি আর দেখিনি। মল্লিকার ছোট চাপা মুখ—কেমন যেন চীনে পুতুলের ছাঁচ লেগে আছে, ছোট ছোট চোখ, এক মাথা চুল, গোলগাল চেহারা, ফ্রক…আমার অসম্ভব ভাল লেগেছিল।

ভাল লাগলেও সেই মনোভাব প্রকাশ করার উপায় ছিল না। আমরা, মফস্বলের ছেলেরা, কলকাতার ছেলেমেয়েদের দিকে আড় চোখে চেয়ে-চেয়ে দেখতাম, তাদের দিকে তাকিয়ে মন খারাপ হয়ে যেত, মনে মনে ভাবতাম ওরা আমাদের চেয়ে অনেক উঁচুতে উঠে আছে। আমরা ওদের হিংসে করতাম। বলতাম, 'স্টাইলিস্ট, চালিয়াত সব—।'

মল্লিকা কলকাতার মেয়ে। তার বাবা-মা এখানে, এই কোলিয়ারির দেশে পড়ে থাকলেও মল্লিকা থাকত কলকাতায়, তার দিদিমার কাছে—সেখানের কোন্ স্কুলে যেন পড়ত। আর

আমি স্কুলটি স্কুলে। কারখানা-শহরের স্কুলে যে পড়ে, যে মাটির খাপরা ছাওয়া দেওয়াল ভাঙা তিন কামরার বোর্ডিংয়ে থাকে, গোল্‌লা সাবান মাখিয়ে কাপড় কেচে পরে—তার সঙ্গে কলকাতার মেয়ের অনেক তফাত।

আমি ঠিক জানি না, তবে হয়ত আমার মনে হয়েছিল, আমার এই দৈন্য লজ্জার কথা মল্লিকা জানে। জানা সোজা। আমাদের দু'পরিবারের মধ্যে যে অন্তরঙ্গতা তাতে তার এ-সব অজানা থাকার কথা নয়। যেমন আমি তার কথা জানি।

ঈশ্বর জানেন, আমি ম্যাট্রিক ক্লাসের ছেলে বলেই কিংবা মল্লিকা আমার ছোট বোনের বন্ধু বলে, না কি আমি মফস্বলের মানুষ বলেই মল্লিকাকে অতখানি তাচ্ছিল্য দেখিয়েছিলাম। খুব সম্ভব এই উপেক্ষা আমার আত্মরক্ষা ছাড়া আর কিছু নয়।

শীতের বিকেল গড়িয়ে যাচ্ছিল। সামনের মাঠটুকুতে আমরা ব্যাডমিনটন খেলতাম। ছোড়দা বাড়িতে ছিল না বলেই সেদিন আর নেট টাঙানো হয় নি। কাজল একটু-আধটু খেলত। বন্ধু পেয়ে সেদিন কাজলও আর এলো না। কলাবাগানের কাছে দোলনাটার উপর ওদের দু'জনকে পাশাপাশি বসে দুলতে দেখলাম। ওরা দুলছিল, গল্প করছিল। আমি কি করব কিছু বুঝে উঠতে না পেরে ছোট ভাইকে সাইকেল চড়া শেখাতে লাগলাম। একবার নিজেই চড়লাম। এক হাত ছেড়ে জোরে চালালাম, স্লো সাইকেলের কায়দা দেখালাম। কলকাতার মেয়ে মল্লিকা হয়ত আমার এইসব বাহাদুরি দেখছিল, কিন্তু কাজলের সঙ্গে গল্প করতে করতে সে এদিকে এক পাও এগিয়ে এল না। বরং গ্যারেজের দিকে—চাকর-বাকরের ঘরের দিকে—যেখানে পুরু ঘাস আর কলাফুলের ঝোপ সেদিকে চলে গেল।

মাঠে আর ঘুরে বেড়ানো ভাল দেখাবে না ভেবে আমি বারান্দায় উঠে গেলাম। বলতে কি, আমি যতক্ষণ মাঠে ছিলাম

এমন কিছু করিনি যাতে মল্লিকা ভাবতে পারে আমি হ্যাংলার মতন তাকে দেখছি। বরং সব সময় সেই পুরনো তাচ্ছিল্য ভাবটাই আমার ছিল, যেন এ-রকম মেয়ে কত আসে-যায় এ-বাড়িতে আমি গ্রাহ্যও করি না।

সন্ধ্যের গোড়ায় মল্লিকা চলে গেল। সঙ্গে বাড়ির চাকর। ঘরে বসে মন্টুর সঙ্গে আমি ক্যারাম খেলছিলাম। পিসিমা বারান্দায় দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কি বলছিল ওদের। হয়ত মল্লিকার মা—আমরা যাঁকে কাকিমা বলি—তাঁকে কিছু বলতে বলে দিচ্ছিল।

একটু পরে কাজল এসে বসল পাশে। আমি তখন বোর্ডের লাল গুটিটা নেবার চেষ্টা করছি।

'ওই মেয়েটা তোর বন্ধু—?' অবজ্ঞার স্বরে কাজলকে শুধোলাম। যেন অমন বাজে মেয়ে কি করে তোর বন্ধু হল! লাল গুটিটা মন্টুর হাতে চলে গেল।

মন্টু গুটি ফেলে দিল। তার গোল গোল চশমার ফাঁক দিয়ে এক পলক দেখে নিল আমাকে। অর্থাৎ আর দুটো গুটি ফেললেই এই বোর্ড তার।

'ওমা, ও ত মল্লিকা—' কাজল বলল। তার বন্ধু মল্লিকাকে না চেনায় সে যেন খুব অবাক হয়েছে।

'খুব চালিয়াত—' আমি বললাম। স্ট্রাইকার আমার হাতে।

'চালিয়াত কেন?' কাজলের কথাটা লাগল।

কেন চালিয়াত সে-দিকে আমি এগুলাম না। 'কলকাতায় থাকে না মেয়েটা?'

'ওর দিদিমার কাছে।...এখানে ত স্কুল-টুল নেই।' কাজল বলল।

'কোন ক্লাসে পড়ে রে?' বোর্ডের শেষ গুটিটা আমি ফেলে দিলাম।

'সেভেনে···এবার সেভেনে উঠেছে।'

ক্লাস সেভেনটা আমার কাছে অনেক ছোট মনে হল, অনেক যেন পিছুতে। আমাদের স্কুলে যারা সেভেন ক্লাসে পড়ে তাদের ছ' একজনকে মনে পড়ল। আমাদের—মানে টেন ক্লাসের ছেলেদের তারা ভীষণ খাতির করে। আমরা তাদের গ্রাহ্যই করি না। মল্লিকা মাত্র সেভেনে পড়ে জেনে আমার কেমন একটা অহমিকা হচ্ছিল, ভাল লাগছিল।

'বাব্বা, ওই ধাড়ি মেয়েটা মাত্র ক্লাস সেভেনে পড়ে—?' নতুন করে ক্যারামের গুটি সাজাচ্ছিলাম আমি।

'ধাড়ি—' কাজল চটে গেল, 'তোমার কাছে সবাই ধাড়ি। আহা নিজে যেন কত ছোট!'

'আমি ষোলো। তুই দে না ষোলো বছরে ম্যাট্রিক।'

'দিতে দিতে তোমার সতের হবে।' কাজল কেমন মুখ বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে বলল। খুব রেগেছে।

'হোক।'

'তারপর ত ফেল করবে।'

'রাখ রাখ, ফেল করব। তোদের মতন কি না!'

'দিদি, তুই খেলতে দিচ্ছিস না—এবার কিন্তু—' মণ্টু শাসালো।

'আমিও খেলব।' কাজল বোর্ড ধরে কোলের দিকে টানল।

'তুই খেলতে জানিস না।' মণ্টু বোর্ড ধরে নিজের দিকে টানতে লাগল।

'না, তোরাই শুধু জানিস!' কাজল ছ'হাতের থাবা দিয়ে বোর্ডের গুটি চেপে রাখল।

'আমি তা হলে খেলব না।' মণ্টু হাত গুটিয়ে নিল।

কাজল একটুক্ষণ বোর্ডের ওপর ঝুঁকে বুক আগলে পড়ে থাকল। তারপর হঠাৎ ছহাতে সব লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে ছিটকে

সরে গেল।...অন্য সময় হলে একটা ছোটখাটো প্রলয় বাঁধত এরপর। মারপিট লেগে যেত ভাইবোনে। আর মারপিট লাগলেই আমরা—ভাইরা সব সময় এক দলে। কাজল বিলক্ষণ জানত কি হতে পারে এবার। ছিটকে সরে গিয়েই ও উঠে দাঁড়াল। 'ছোটলোক, অসভ্য কোথাকার—' কাজলের চোখমুখ রাগে বিশ্রী দেখাচ্ছিল। আমার দিকে চেয়ে বলল, 'দাঁড়াও, ও আসুক আমি বলে দেব, তুমি ওকে চালিয়াত বলেছ, ধাড়ি বলেছ।'

কাজল নিশ্চয় কথাটা কোনোদিন বলে নি। অনেক বছর পরে, যখন মল্লিকার সঙ্গে আমার খুব ভাব, তখন একদিন বলেছিলাম, 'ইস, তোমায় আমি ফ্রক-পরা দেখেছি।'

'ঘোড়ার ডিম দেখেছ।'

'দেখিনি?'

'কবে?'

'সেই যে, ঠাকুমা যেবার মারা গেল—তার ক'দিন পরে তুমি চাকরের সঙ্গে আমাদের বাড়ি গিয়েছিলে—ফ্রক সোয়েটার জুতো মোজা—একেবারে মেম মেম...'

'আমার মনে নেই।'

'আমার আছে।'

'তোমার ত অনেক কিছু মনে আছে।' মল্লিকা ঠোঁট টিপে হাসল। একটু থেমে বলল, 'আমার শুধু মনে আছে একবার আমি কাজলকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ওই ছেলেটা কে রে—একেবারে চাষা।'

'ভাগ, চাষা বলবে! তুমি চিনতে না আমাকে?'

'না।'

'মিথ্যে কথা।'

'বা, আমি কোত্থেকে চিনব। তুমি কি এমন ছিলে বাপু!

৩.

কথাটা মিথ্যে নয়, আমি এমন কিছু ছিলাম না যে আমায় চিনতে হবে। মল্লিকাদের পরিবারের সঙ্গে আমাদের পরিবারের সম্পর্কটা শুরু হয়েছিল গুরুজনদের কেন্দ্র করে। সে অন্য কথা। এই পারিবারিক অন্তরঙ্গতার সঙ্গে সরাসরি কোনো যোগ ছিল না আমার।

আমাদের পরিবারের কথা এখানে একটু বলতে হয়। আমাদের পরিবারটি ছিল যুক্ত, স্নেহে ভালবাসায় দায়িত্বে এমন কি আদর্শেও। বাবা ছিলেন রেলের চাকুরে, কাকারা থাকতেন আশেপাশে বিশ-পঁচিশ মাইলের এলাকার মধ্যে, ঠাকুমা বেঁচে ছিলেন। নেহাত কর্মক্ষেত্র আলাদা বলে তিনটি সংসার—তিন হাঁড়িতে ভাত—নয়ত তিন বলে কিছু ছিল না মনের দিক থেকে, সব এক। যেমন এক গাছে তিনটি শাখা, কিংবা একই শাখায় তিনটি ফুল। জন্মকাল থেকেই নিছক মা বাবা চিনি নি, ঠাকুমা পিসিমা কাকা কাকিমা চিনেছি, পাঁচের কোলে মানুষ হয়েছি। এর ফল হয়েছিল, আমাদের পরিবারে কেউ বোধ হয় একা—একার মতন—নিজের মতন কিছু করতে পারত না। আমরা ছেলেরা নিজেদের মধ্যে হাসি-ঠাট্টা করে বলতাম, তিন কর্তার মত আর শেষ পর্যন্ত তিন কর্তার মানে তিন মন্ত্রীর মাথায়-তোলা মহারানীর 'হ্যাঁ' হলে তবে সংসারের গুটি নড়বে, নয়ত নয়।

যেমন আমার কথাই ধরা যাক। তের বছর বয়সও পুরো হয়নি—কাকা বললেন: 'ওকে ভাল স্কুলে ভাল হোস্টেলে রেখে পড়াতে হবে—নয়ত গোল্লায় যাবে ছেলেটা।' এক মাথা নড়ল ত আরও দু মাথা নড়ে উঠল। আর মহারানী—মানে ঠাকুমার সাদা মাথাটা দুলল: 'ঠিক, ওটা বাড়ির বড় এখন, ও-সব ঘর ঘর বাই ধরলে হবে না। ভাল জায়গাতেই দাও।'

তেরোর আগেই বাড়ি ছাড়া হলাম। ভাল স্কুল ভাল হোস্টেল

সবই হল, বছর দুই কাটল সেখানে, তারপর আর পোষাল না। চালান হলাম কুলটি স্কুলে। বলতে কি, আগের স্কুলের চেয়ে এই স্কুল আমার অনেক অ-নেক ভাল লেগেছিল। হয়ত এই স্কুলের অতখানি দেমাক-দম্ভ ছিল না, লাল ইটের দোতলা ছিমছাম ঘর ছিল না, কিন্তু আর সব ছিল। সম্পর্ক স্নেহ ভালবাসা প্রাণ—সব। খুব সম্ভব আমার গুরুজনেরা একটা জিনিস ভুল করেছিলেন, ছেলে বয়সের মনকে একটু ছায়ায়-মায়ায় থাকতে দিতে হয়—তাতে গাছটা বাঁচে।

বাড়ির সঙ্গে আমার যোগটা থাকত ছুটি-ছাটায়। নয়ত আমি সংসারের বাঁধা স্রোত থেকে আলাদা হয়ে পড়েছিলাম।

মল্লিকার বাবা যে কোলিয়ারিতে কাজ করতেন, কাকা কিছুকাল আগে সেই কোলিয়ারিতে এসেছেন। ঠাকুমা কাকার কাছে। আমাদের সবারই তখন যাওয়া আসা ওখানে। তারপর ঠাকুমা মারা গেলেন। আমাদের পুরো সংসারটা তখন ওখানে জড়ো হয়েছে।

ঠাকুমার অসুখের চিঠি পেয়ে আমি এসেছিলাম। একবারে শেষ সময়। ঠাকুরমার তখন কথা বন্ধ হয়ে এসেছে। তবু আমার ডাক শুনে একবার চোখ খুলেছিল বুড়ি, সেই আমাদের মহারানী, চোখ খুলে ডান হাতটা বাড়িয়ে যেন একবার শেষবারের মতন থুতনি ছুঁয়ে চুমু খেতে চাচ্ছিল—পারছিল না, হাত কাঁপছিল, হাত আর উঠছিল না। শুধু জড়ানো অস্পষ্ট গলায় বলল, 'তুইও এসেছিস—।'

পরের দিন ঠাকুমার শরীরটাকে কোলে করে তিন ছেলে আর ছোড়দা মিলে মোটরে তুলে নিয়ে চলে গেল। ত্রিবেণী।

আজও স্পষ্ট মনে আছে, মোটরটা যেই গেট ছেড়ে বাঁ দিকে কোলিয়ারির রাস্তা নিল—এক দমকা ধুলো মোটরের পিছু থেকে

উড়ে যেন আমার মুখে এসে দম বন্ধ করে দিল। শিশুগাছতলায় আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলাম। বাংলোর বারান্দায় দাঁড়িয়ে মা কাকিমা কাঁদছিল, পিসিমা মাঠে—কান্নার একটা চাপা চাপা সুর বাতাসে ভাসছিল।

এই শিশুগাছতলায় দাঁড়িয়ে ছিলাম সেদিনও। ঠাকুমার কথা ভাবছিলাম। গেট খোলার শব্দে তাকিয়ে দেখলাম মল্লিকা।

দিন কয়েক পরে আমি ফিরে গেলাম স্কুলে। কুলটিতে। শ্রাদ্ধের সময় এসেছিলাম। মল্লিকাকে দেখিনি। ততদিনে সে কলকাতা ফিরে গেছে আবার।

মল্লিকার কথা আমার মাঝে মাঝে মনে পড়ত। কেন পড়ত জানি না। হয়ত এই জন্যে যে, অমন মেয়ে—অমন সুন্দর ফিটফাট মেয়ে আমি আগে আর দেখি নি। কিংবা এমনও হতে পারে, কলকাতা শহরের একটি মেয়েকে আমি চিনি, মেয়েটি আমায় চেনে, এতেই মনে মনে আমি ধন্য হয়ে গিয়েছিলাম।

আমাদের কুলটি স্কুলের বোর্ডিং বলতে বাস্তবিক কিছু ছিল না। স্কুলের একেবারে সামনাসামনি বাবু কোয়ার্টার্সের একটা বড় মতন কোয়ার্টারে আমাদের থাকতে দেওয়া হয়েছিল। তিন চার জন মাস্টার আর আট দশটি ছেলে মিলে থাকতাম। মাথার ওপর খাপরার চাল, তলায় চটের সিলিং, চুনকাম করা কিন্তু ছেঁড়া। ইলেকট্রিক ছিল না। বাড়িটার চারপাশে লতার বেড়া, পণ্ডিত মশাইদের ঘরটার দিকে একটু বারান্দা, সামান্য খোলা জমি আর একটা কদম গাছ ছিল। আশেপাশে আরও গাছ ছিল, তেঁতুল আর নিম গাছ। বোর্ডিংয়ের চারপাশেই বাবু কোয়ার্টার্স। বোর্ডিং বলে কোনো ভেদাভেদ ছিল না। যার খুশি যখন খুশি বোর্ডিংয়ের সীমানা দিয়ে সবাই যেত আসত। পাড়ার ছেলেমেয়েরা ছুটত খেলত চেঁচাত—বোর্ডিংয়ের ঘরে ঢুকে পড়ত, লুকত।

আর এক একদিন আচমকা কোনো মেয়েকে দেখে আমার মল্লিকার কথা মনে পড়ে যেত।

এই মেয়েদের কেউ মল্লিকার মতন সুন্দর ছিল না। মল্লিকার মতন চাঁপা রঙ ছিল না কারুর, অমন ছোট্ট কপাল, অত সুন্দর ফ্রক, ওই মুখ আর দেখি নি। তবু, ওদেরই এক একজনকে দেখে হঠাৎ মল্লিকাকে মনে পড়ত।

একদিন, আমরা—আমি অমর তারাপদ মায়ানাথ রোজকার মতন বিকেলে বেড়াতে বেরিয়েছি জি. টি. রোড ধরে। বরাকরের দিকে হাঁটছি, গল্প করতে করতে, মাত্র দুটো সিগারেট চার জনে ভাগাভাগি করে টানছি, এবং এই সিগারেট টানতে পেরে নিজেদের খুব সাবালক ভাবছি। সবাই খুব উৎফুল্ল হালকা মেজাজে পথ চলেছি—হঠাৎ সবাই প্রায় চমকে গেলাম। রাস্তার পাশে মাঠ থেকে তিন চারটি মেয়ে এবং এক ভদ্রলোক উঠে আসছেন।···তারাপদ সিগারেট লুকিয়ে নিল। পাড়ার কোনো বাড়ির লোকজন হবে হয়ত, আমাদের চেনে। একটু ভয় ভয় করছিল, কি জানি আমাদের মুখের সিগারেট এতক্ষণে ওরা দেখেই ফেলেছে।

মেয়েদের দলটা হাসতে হাসতে গায়ে টলে পড়তে পড়তে রাস্তায় উঠে এল, পেছনে ভদ্রলোক, হাতে ক্যামেরা। ফুলপ্যান্ট আর হাফ হাতা সিল্কের শার্ট। ওরা কাছে এলে আমরা অবাক হয়ে দেখলাম—এদের কাউকে আমরা চিনি না। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, ওরা কেউ কুলটির লোক নয়। একটি বউ, একটি শাড়ি-পরা মেয়ে আর দুটি ফ্রক-পরা বড় মেয়ে। সবাই বেশ ছিমছাম, সুন্দর সুন্দর কাপড় জামা গায়ে, কেমন করে যেন চুল বাঁধা। ফ্রক-পরা মেয়ে দুটির লম্বা লম্বা বিনুনি বুকের ওপর টানা। বউটির চোখে রোল্ডগোল্ডের চশমা। শাড়ি-পরা বড় মেয়েটির খোঁপায় ফুল, ফ্রক-পরা দুটো মেয়েরই টানা টানা চোখ।

ওরা সবাই এক পলক আমাদের দিকে তাকিয়ে আবার যে যার নিজের মতন গায়ে গা ঘেঁষে, হাসতে হাসতে এগিয়ে চলল। ভদ্রলোক আমাদের দিকে একটু চোখ তুলে চাইলেন, হাতের ক্যামেরাটা বুকের কাছে তুলে সিগারেট ধরালেন। আমাদের সকলের চোখ ক্যামেরায় ঠিকরে পড়ল।

পলকে যেন কি হয়ে গেল, আমরা বোকার মতন দাঁড়িয়ে থাকলাম, ওদের দলটা, যে-রাস্তায় আমরা এসেছি সেই রাস্তা ধরে উলটো মুখে হাঁটতে লাগল। ওখানের বাতাসে তখনও বুঝি একটু সেন্ট আর স্নো-পাউডারের গন্ধ ভাসছে।

দু'চার পা এগিয়ে আমরা সবাই দাঁড়ালাম। পিছু ফিরে চেয়ে থাকলাম। জি. টি. রোড ধরে ওদের দলটা চলে যাচ্ছে, হল্লা করতে করতে হেসে গড়িয়ে এ-ওকে ঠেলে দিয়ে।

বেশ একটু দূর হয়ে গেল ওরা। আর হঠাৎ কানে এল—ওরা সবাই মিলে কোরাসে গান শুরু করে দিয়েছে ঃ

"দিনের শেষে ঘুমের দেশে ঘোমটা পরা ওই ছায়া…"

আমাদের কুলটি স্কুলের চারটি নাবালক ছেলের কাছে সমস্ত ব্যাপারটা স্বপ্নের মতন মনে হল। কিংবা সিনেমার মতন। কুলটিতে এমন জিনিস হতে পারে না, হয় না। আমরা চার বন্ধু বোকা বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। বিকেল পড়ে ছায়া ছায়া হয়ে আসছিল।

অমর বলল, 'চল, ওদের ফলো করি—কোন্ বাড়িতে যায় দেখি।'

আমরা সবাই আবার ফিরতে লাগলাম। সামনের দলের গানটা তখনও ভেসে আসছে ঃ

"ও পারেতে সোনার কূলে আঁধার মূলে কোন মায়া গেয়ে গেল কাজ ভাঙানো গান…"

'মুক্তির গানটা গাইছে রে'—মায়া বলল।

'তুলসী থাকলে আমরাও লাগিয়ে দিতুম—' তারাপদ বলল।

'গানটা রবীন্দ্রনাথের—' আমি বললুম।

'তাতে কি, যার হোক। পঙ্কজ মল্লিক গেয়েছে না মুক্তিতে, ফাস্ট´ক্লাস গানটা মাইরি—'

আমাদের পা জোরে জোরে চলছিল। প্রায় ছুটছিলাম আর কি।

'সব ক'টাই, খুব চালু্লু রে, মাইরি। পরী সেজে বেরিয়েছে।' অমর বলল।

'মেয়েটা বিউটিফুল।' তারাপদ বলল।

'কোন মেয়েটা, শাড়ি-পরাটা?' অমর শুধলো।

'সক্কলেই, তবে ফুল-ফুল ছিটের ফ্রক-পরাটা সব চেয়ে বিউটিফুল—'

'তোর চয়েস।…আমার শাড়ি-পরাটাকে মোস্ট্ বিউটিফুল লাগল'—অমর বলল।

'আমায় একটা চয়েস দে—' মায়া মাথা ছুলিয়ে ছুলিয়ে হাসছিল, 'বিনুনিতে বেগুনি ফুল বাঁধাটা আমার—'

অমর তারাপদ মায়া—সবাই হো হো করে হেসে উঠল। অমর আমার দিকে চেয়ে বলল, 'তুই ফক্কা পড়ে গেলি শ্যামলা, আর নেই।' সবাই মজার তোড়ে হেসে উঠল, আমিও হাসলাম। হাসি থামলে অমর মায়াকে বলল, 'এই মায়া, তোর ত একটা আছে, সেই যে—সেই বর্ধমান…'

মায়া হঠাৎ ভারিক্কি চালে হাঁটতে লাগল, মুখটা গম্ভীর করে নিল, মাথার চুলে হাত বুলালো একবার।

'বর্ধমান কি রে?' তারাপদ অবাক হয়ে শুধলো।

'সে আছে একজন মায়ার—' বলে অমর মায়ার পাশে এসে তার গলা জড়িয়ে হাঁটতে লাগল।

মায়া কোনো কথা বলছিল না। যেন আমাদের দলের মধ্যেই

আর সে নেই। তার ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছিল, সে এমন কিছু একটা জানে, আমরা জানি না। মুখটাকে খুব রহস্যময় করে তুলেছিল মায়া। আমাদের যেন সামান্য অবজ্ঞার চোখেই দেখছিল।

তারাপদর আর সহ্য হচ্ছিল না। খানিকটা দূরে একটা অচেনা দল বিরাট কৌতূহলের হাতছানি হয়ে আমাদের ভুলিয়ে নিয়ে চলেছে, তার ওপর আবার এখানে—এই বন্ধুদের মধ্যে মায়া আর-এক কৌতূহলে আমাদের দম বন্ধ করে তুলেছে। তারাপদ চটে গিয়ে বলল, 'বর্ধমানের কথাটা বলবি ত বল, নয়ত সামনে বেড়ে যা—একসঙ্গে যেতে হলে ও-সব হেঁয়ালি চলবে না।'

অমর মায়ার দিকে তাকাল, মায়া অমরের হাত ধরে টেনে কি যেন ইশারা করল। তারপর অমর আমাদের দিকে চেয়ে চোখের এক অদ্ভুত ভঙ্গি করে হাসল। 'বর্ধমানে মায়ার একজন মেয়ে আছে। প্রেম চলছে খুব।'

প্রেম! আমরা অবাক চোখে মায়ার দিকে চেয়ে থাকলাম। কথাটা কী বুঝলাম কেমন বুঝলাম কে জানে—হঠাৎ যেন মায়াকে আর নাগালের মধ্যে ছুঁতে পেলাম না। মায়াকে তখন আর বন্ধু বলে ভাবতেই পারছিলাম না।

'কি যেন নামটা রে মায়া, অর্চনা না—?' অমর বলল।

মায়া সগৌরবে মাথা নাড়ল। হাসল একটু।

চুপচাপ। আমরা একেবারে চুপ। সামনের দল কুলটি বাজারের কাছে ডান দিকের রাস্তাটা ধরল। তারাপদ হঠাৎ বলল, 'ওরা সব কলকাতার লোক, কলকাতার মেয়ে...'

মল্লিকার কথা মনে পড়ছিল আমার। মনে পড়ছিল আর বুকের মধ্যে কেমন একটা গরম গরম লাগছিল।

'আমার সঙ্গে একজনের ভাব আছে।' আমি হঠাৎ বললাম।

ওরা তিনজনেই আমার দিকে তাকাল।

'তুই চিনিস ওদের ?' অমর অবাক।

'ওদের কেন চিনব, আমি অন্য একজনকে চিনি।'

'কলকাতার মেয়ে ?'

'কলকাতার, বড়লোকের...'

'কোথায় ভাব হল ?'

'আমাদের কোলিয়ারির বাড়িতে...'

'কি নাম ?'

'মল্লিকা।'

মায়া অমর তারাপদ তিনজনে আমায় ঘিরে ধরেছিল। ওদের চোখের পাতা পড়ছে না। মুখ হাঁ হয়ে আছে। বরাকর-আসানসোল বাসটা ঝাপটাতে ঝাপটাতে চলে গেল। মাঠের কেমন একটা সুন্দর গন্ধ আসছিল, সন্ধ্যের ছায়া গাঢ় হয়েছে। বেশ খুশী খুশী লাগছিল। আর কেন যেন তারাপদ মায়া অমর—তিনজনকেই কেমন দীন দীন মনে হচ্ছিল।

অমরই কথা বলল প্রথমে। কেমন হ্যাংলা হ্যাংলা গলায় বলল, 'খুব ভাব তোর সঙ্গে ?'

'না।'

'তবে ?'

'ভাব আছে।' আমার বুকের মধ্যে ধক ধক করছিল।

ওরা সবাই চুপ। কি বলবে ভাবছিল। মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছিল। শেষে তারাপদ হঠাৎ বলল, 'প্রেম চালা—', বলে হাসল। মায়া অমর হাসল। হেসে এ ওর গলা জড়িয়ে ধরল।

কথাটা কেমন শোনাল কানে। হাসিটা বিশ্রী লাগল। ইতর খারাপ কথার মতন। তারাপদরা যেন আমার মনের কোথাও কালি ছিটিয়ে দিল।

মায়া আমার হাত ধরে টানল, হাসল একটু, 'বেশ নাম রে। ম-ল্লিকা। ফাইন নাম। আমারটার একেবারে পুজো পুজো গন্ধ।'

মায়া আমার গলা জড়িয়ে গালে একটা চুমু খেয়ে ফেলল, 'আমারটা কিন্তু দেখতে বেশ রে—বেশ সুন্দর। তোরটা—?'

মায়ার হাত সরিয়ে নিজেকে আলাদা করে নিলাম। ধুতির কোঁচা দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে হঠাৎ মনে হল আমি কি যেন একটা অন্যায় করে ফেলেছি। ভীষণ অন্যায়। আমি মিথ্যে কথা বলেছি। সাংঘাতিক মিথ্যে কথা। মল্লিকার সঙ্গে আমার ভাব নেই। একটুও না। কেন তবে বললাম। কেন? ছি ছি। ওরা যদি জানতে পারে আমি মিথ্যে বলেছি, তবে—!···আফশোস হচ্ছিল, কেন সেদিন একটু ভাব করলাম না মল্লিকার সঙ্গে···! সেই একটু ভাব থাকলেও আজ এত মন খারাপ লাগত না। বিশ্রী লাগছিল, দুঃখ হচ্ছিল, একটা কাঁটা খচখচ করছিল।

মল্লিকার চোখ থেকে ভয়ে ভয়ে যেন মুখ সরিয়ে নিচ্ছি—এমনভাবে মুখ তুলে তাকালাম। সামনে। সামনে আকাশ, ফিকে অন্ধকার আর গাছের মাথায় একটি জ্বলজ্বলে তারা।

৪.

জ্যাক আর সোনার লণ্ডনের গল্পের মতন কলকাতাও আমাদের কাছে প্রায় সোনায় বাঁধানো শহর ছিল। লণ্ডনে এসে জ্যাকের স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল, কলকাতায় পড়তে এসে কিন্তু আমাদের স্বপ্নভঙ্গ হয়নি। জ্যাকের মতন অতটা বোকা সরল ছেলেমানুষ আমরা ছিলাম না। আমরা জানতাম, শহর কলকাতার রাস্তা সত্যিই আর সোনা দিয়ে বাঁধানো নয়। তবে কিনা এই শহর যে স্বপ্নের—এই শহরের রাস্তা-ঘাট দোকান-পশার গাড়ি-ঘোড়া আকাশ-বাতাস যে কী এক চুম্বকের জাদু দিয়ে মাখানো—এ বোধহয় শহরে পা দিয়েই বুঝতে পেরেছিলাম।

তবু প্রথম যে মুখ দেখাদেখি—সেই প্রথম পরিচয় না রোদ না রঙের মধ্যে হয়েছিল। জুন মাসের কলকাতা বৃষ্টিতে ভিজছে।

সারাদিন বৃষ্টি, পশলা পশলা। মৌসুমি হাওয়া মাখামাখি কেমন এক ভিজে বাদল বাদল গন্ধ চারপাশে। বাড়ির মাথার ওপর নুইয়ে পড়া আকাশটা যেন মস্ত এক ভেজা শেল্টের টোপর। রাস্তা ঘাট জল-পিছল। এমন বর্ষা দেখি নি আগে, এ-বৃষ্টির জলও যেন শহুরে। কুলটি কি ওদিকের মতন জলের ধারার সাদা চিক্ ঝুলিয়ে মাঠ ঘাট ডুবিয়ে দূর দূরান্ত আচ্ছন্ন করে এখানে বৃষ্টি আসে না। ঝিঁঝি ডাকে না, ব্যাঙ ডাকে না। তবু প্রথম দিন বউবাজারের গলিতে ট্যাক্সি থামলে মনে হয়েছিল কলকাতার গন্ধ কলকাতার বাতাস আমাকে অবশ করে ফেলেছে।

কাকার সঙ্গে কলেজে কলেজে ঘুরলাম। ভাল কলেজ ভাল কলেজ করে কাকার আশা আর মিটছিল না। আমি পিছু পিছু আছি। ট্রাম দেখছি, বাস দেখছি, লোকজন এমন কি ট্রামের কণ্ডাক্টারও তখন দেখার বস্তু। দোতলা বাসে চড়ি চড়ি করেও চড়া হচ্ছে না। মনে হত, পৃথিবীর নবম আশ্চর্য ওই দোতলা বাস। অত বড় বাস কি করে যে যায়—আমি বুঝে উঠতে পারতুম না। কলকাতার বাড়িতে সমবয়সী ভাই ছিল—সম্পর্কে খুড়তুতো ভাই, কলকাতার ছেলে, হেয়ার স্কুলে নাইন ক্লাসে পড়ে, বছর বছর ফেল করে, মাস্টারের মাথা তাক করে ইঁট ছুঁড়েছে বার কয়, ফুল প্যাণ্ট আর শার্ট পরে বিকেলে ইডেন গার্ডেনে হাওয়া খেতে বেরোয়, হাতে মাউথ অরগ্যান, অজস্র বন্ধু তার, দুপুরে নিচের ঘরে তাস পেটে। এই ভাইয়ের সঙ্গে বউবাজারের মোড়ে দাঁড়িয়ে সরবত খেলাম, ইডেন গার্ডেন বেড়িয়ে এলাম, সিনেমা দেখলাম, সিগারেট টানলাম—আর শেষ পর্যন্ত চেহারায় বেশভূষায় কলকাতার ছোঁওয়া লাগল। দিন পনেরোর মধ্যে ভাই আমায় অনেক কিছু শিখিয়েছিল। অনেক কিছু দেখিয়েছিল, মায় একটি মেয়ের ছবি এবং খান পাঁচেক চিঠি।

'এ কোথায় থাকে জানিস ?'

'কোথায় ?'

'বালিগঞ্জে।'

বালিগঞ্জ দেখি নি, নামটা শোনা। চোখ বুজলে একটা ছবিও দেখতে পাই, রেশম-ছবি যাকে বলে তেমন ছবি। বাংলা গল্প-উপন্যাসে তখন বালিগঞ্জের ভীষণ চল। আমরা—অন্তত আমি এন্তার সে-সব বই পড়েছি, পড়ি, এবং সেই স্বপ্নলোকের দিকে বোকার মতন তাকিয়ে থাকি।

'বেশ দেখতে।' আমি বললাম। মেয়েটিকে ভালই দেখাচ্ছিল।

'আরে এ ত ফটো, সামনা-সামনি দেখলে একেবারে চোট খেয়ে ঠিকরে যাবি।' ভাই চোখ মুখের যে ভঙ্গি করে কথাটা বলল মনে হল এমন ভঙ্গি শুধু কলকাতার ছেলেরাই পারে।

কলকাতার দু-পাঁচটা বোল তখন কানে সয়ে গেছে, মানেটা বুঝতে শিখেছি। ভাইয়ের কথাটা ধরতে পারলাম।

'নাম কি জানিস ওর ?' ভাই এমন করে বলল, তাকাল, মনে হল যেন আমায় সে অকল্পনীয় কিছু শোনাবে। একটু থেমে বলল, 'ওর নাম আইভি···। কেমন নাম রে—?'

আইভি! আইভি নামটা কেমন কানে শোনায়। বিলিতী বিলিতী। বললাম, 'বিলিতী নাম—'

'বালিগঞ্জের মেয়েদের নাম ওই রকমই হয়।···তুই একটাও বেলা চাঁপা লক্ষ্মী—এ-সব ম্যাড়মেড়ে নাম বালিগঞ্জে পাবি না।'

একবার ইচ্ছে হল জিজ্ঞেস করি, মল্লিকা—মল্লিকা নামটা কি বালিগঞ্জে চলে! পারলাম না ; সাহস হল না। কে জানে হয়ত ও বলবে, ও-সব মল্লিকা-ফল্লিকা ওখানে চলে না।

'আই. এ. পড়ে—তা জানিস—' ভাই বলল।

আমি অবাক। ওই মেয়ে যদি আই. এ. পড়ে—তবে ক্লাস নাইনের ছেলের সঙ্গে তার ভাব হয় কি করে ?

'তোমার সঙ্গে অনেক দিনের ভাব—?' আমি বিশ্বাস অবিশ্বাসের দ্বিধা নিয়ে শুধোলাম।

'ভাব কি রে, ও ত আমার লভার।' আমায় যেন স্নেহবশে কিঞ্চিৎ ধিক্কার দিয়ে ভাই অসাধারণ একটা গর্বে তাকিয়ে থাকল। 'চার মাস ধরে প্রেম চলছে—চিঠিগুলো পড় না···'

চিঠির একটা খাম এগিয়ে দিল ভাই। দোতলার পশ্চিম দিকের ঘরটায় পালংকের ওপর আমরা দুই ভাই বসে। দরজা বন্ধ, বারান্দার দিকে জানলাগুলোও বন্ধ করে দিয়েছে ও। বাতি জ্বলছে। রাত দশটা বাজে। রাস্তার দিকের জানলা খোলা। বাইরে ঝির ঝির বৃষ্টি। লুকোনো একটা সিগারেট বার করে ফ্যানের রেগুলেটারের স্পার্ক লাগিয়ে সিগারেটটা ধরিয়ে নিল ও।

চিঠিটা পড়ার আগে বুক কাঁপছিল, বড় গরম গরম লাগছিল কান দুটো, বার বার চোখের পাতা পড়ছিল। প্রায় দম বন্ধ করে, মুখ আড়াল করে যেন চিঠিটা পড়ে ফেললাম। হাতের লেখাটা বড্ড খারাপ। 'বৃষ্টি' বানান ভুল লিখেছে আগাগোড়া, 'ষ্ট' না সব 'স্ট'; চিঠি চিঠি কতবার যে লিখেছে, কিন্তু সব চিঠি 'চিটি' হয়ে আছে।···তবু এই খারাপ হাতের লেখা ভুল বানান সত্ত্বেও চিঠিটা যেন আমার মন আনমনা করে তুলল।

'পড়লি?' হাত বাড়িয়ে চিঠিখানা টেনে নিল ও। ভাঁজ করে খামে পুরতে পুরতে বলল, 'সেরেফ মাউথ অর্গান বাজিয়ে গেঁথে ফেললাম। তোর দিব্যি বলছি, অ্যায়সা আঁটা হয়ে গেল মাইরি—এখন প্রত্যেক শনিবারে ইডেন গার্ডেনে এসে বসে থাকে।'

ইডেন গার্ডেনের খানিকটা অস্পষ্ট ছবি মনের মধ্যে ছলাত করে ছলকে উঠল। গাছপালা, ফুলঘাস, প্যাগোডার পাশে সেই জল।

'তুই শুয়ে পড়। আমায় আবার একটা চিঠি লিখতে হবে।'

ঘুম পাচ্ছিল অনেকক্ষণই থেকে। খাটে পা উঠিয়ে বসলাম। খাটো গলায় গুন গুন করে ভাই কি একটা সুর ভাঁজতে

লাগল, গলির দিকে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে সিগারেটটা শেষ করছে আর কি। গানের সুরটা ছেড়ে দিয়ে গুনগুনিয়ে গান ধরল, সিনেমার গান। দু কলি গেয়ে থেমে গেল।

শুয়ে পড়েছিলাম, চোখের পাতা তখনও বুজতে পারিনি, বাতিটা জ্বলছে, ভাই বিছানায় এসে তার বালিশের তলায় সেই ছবি আর চিঠি রাখল।

'এখানে রাখছ?'

'আই বাপ্, না রাখলে ঘুমই হবে না।' গায়ের গেঞ্জিটা খুলে আবার উলটো করে গায়ে দিল ও, 'ঘুমোবার আগে আমি একটা কিস্ করি ওকে, ভোরে উঠেই আর একটা কিস্…'

ভাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম কেমন একটা অভি-ভূত অবাক সঙ্কোচের চোখে। কি বলল ও! কি বলল! ঘরের বাতিটা যেন ছাদ থেকে খসে আমার মুখের ঠিক ওপরে এসে জ্বলছিল। চোখ জ্বালা করছিল, গালে যেন তাত লাগছে, নিশ্বাস জোরে জোরে পড়ছিল।

বাইরে বৃষ্টি। মল্লিকবাড়ির আস্তাবলে ঘোড়াটা পা ঠুকছে।

বাতিটা কেউ নিভিয়ে দিলে বাঁচতাম।

চোখ বুজে কত কি আজেবাজে কথা ভাবতে লাগলাম। ট্রামের তারে আগুন জ্বলা, দোতলা বাস, কুলটি স্কুল, অমর…। ভয় হচ্ছিল, এই সব ভাবনা থামিয়ে দিলে বুঝি এখুনি মল্লিকার মুখ ভেসে উঠবে।

মল্লিকাকে কিছুতেই আমি ভাবব না এখন। কিছুতেই না। আমি নদীর ঢেউ মনে করার চেষ্টা করতে লাগলাম। নদী আর পাই না। যদি বা পেলাম শেষ পর্যন্ত সে-নদীতে জলের ঢেউ ছিল না।

ভাল কলেজেই অ্যাডমিশান পেয়ে গেলাম, কলেজ হোস্টেলে সিটও জুটল। কলকাতায় আর বৃথা বসে থাকা। কলেজের সেশন শুরু হতে কিছুদিন দেরী আছে। বাড়ি ফিরতে হল। জামা-কাপড়-বিছানা-বাক্স গুছিয়ে তবে না স্থায়ীভাবে কলকাতা-বাসী হতে হবে।

প্রায় দিগ্বিজয়ী ভঙ্গিতে বাড়ি ফিরলাম। খুশীটা যেন চোখে-মুখে উথলে ছিল, খানিকটা অহংকার হাবেভাবে। ভবিষ্যতের স্পষ্ট কোনো ছবি ছিল না চোখের সামনে—না থাক, স্বপ্নে বিভোর হতে বাধা কোথায়!

বাড়িতেও বেশ একটা খুশী-খুশী ভাব তখন। পনের দিন আগেও যে ছেলে গুরুজনের চোখে নাবালক ছিল ক'দিনের মধ্যেই তাকে প্রায় সাবালকের সম্মান দিয়ে ফেলেছে সকলে। রাত্রে শোবার জন্যে নেয়ারের খাটটা একাই পেলাম। আলাদা করে ভালমন্দ খাদ্য কিছু। পিসিমা বলল, 'তোর ওই দাড়িটাড়ি কামা ত বাপু!'

পরের দিন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ছোড়দার সেফটি রেজারে দাড়ি কামালাম। দু জায়গায় কাটল, ডান গালে, থুতুনির ওপরটায়। তবু, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে হঠাৎ সেদিন ভীষণ পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর মনে হয়েছিল। আমি আমার নতুন মুখ দেখে খুশী এবং বিহ্বল হয়েছিলাম।

সে-দিন দুপুরটা খুব নিঃঝুম লাগছিল। বাইরে রোদ চাপা চাপা, ঘোলাটে। গুমোট গরম। ফ্যানের বাতাসে ঘর আগুন। শুয়ে শুয়ে চোখ বন্ধ করে কলকাতার স্বপ্ন দেখছিলাম। হঠাৎ মনে হল দরজার খড়খড়ি দিয়ে আর আলো আসছে না। কেমন যেন অন্ধকার।

বাইরে এসে দেখি মেঘে আকাশ ভরে গেছে, বাতাস বইছে

জোরে, ঠাণ্ডা বাতাসও গায়ে লাগল, কাছে কোথাও বৃষ্টি নেমেছে। বিকেলের গোড়ায় বৃষ্টি নামল। ঝড়ো বাতাসের দমকায় শিশু-গাছটা ডালপালা আছড়াতে লাগল।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সব পরিষ্কার। আকাশ ধোয়ামোছা, রাস্তা ভিজে, মাটি নরম হয়ে গেছে, গাছপালার সর্বাঙ্গ সিক্ত।

সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। কাজ ছিল বাজারে। দর্জির দোকান, কাপড়ের দোকান এদিক-সেদিক ঘুরে যখন বাড়ি ফিরছি তখন বিকেল পড়ে আসছে। ধোয়া আকাশে দু-এক খণ্ড হালকা মেঘ। আকাশটায় কেমন আভা হয়ে রয়েছে। হালকা সোনার মতন রঙ ছড়িয়ে আছে চারপাশে। ভেজা মাটি, গাছ-পালার গন্ধ ঘোর হয়ে আছে এদিকটায়।

রেল ফটক পেরিয়ে আসতেই চোখে পড়ল, ঢালু রাস্তাটা দিয়ে ওরা আসছে—মল্লিকার মা, মল্লিকা, তার ছোট ভাই টুলু।

কাছাকাছি আসতেই সাইকেল থেকে নেমে পড়লাম। মল্লিকার মা—কাকিমা দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। সহাস্য মুখ, ঠোঁটের আগায় কথা ফুটে রয়েছে।

'কোথায় গিয়েছিলি ?' কাকিমা শুধোলেন।

'বাজারে।'

'বাজারে গেলি ত খালি হাত কেন, দু-চারটে জিনিসপত্র তোর সাইকেলে ঝুলবে না—!' কাকিমা হাসছিলেন।

'দর্জির কাছে গিয়েছিলাম।' আমিও হাসলাম একটু।

'এবার ত তুই আমাদের কলকাতার লোক হলি রে !' কাকিমা চিবুক ধরে নেড়ে দিলেন।

লজ্জা করছিল। মল্লিকা হাত কয়েক দূরে দাঁড়িয়ে। পথের পাশে কাঁটা গাছে ফুল ফুটেছে, হলুদ ফুল—, সেই ফুল দেখছে। হালকা বেগুনি রঙের পাতলা ফ্রক গায়ে। আঁটো করে চুল বাঁধা। টুলু রাস্তার পাশে মাঠে নেমে ভেলভেট পোকা ধরছে।

'তা, তোর কলেজটা ত আমাদের পাড়ায় হল। থাকবি কোথায়?'

'হোস্টেলে।'

'হোস্টেলটা কোথায়?'

'শ্যামবাজারে।'

'তা হলে ত কাছাকাছি। আমার মা থাকে টালায়'—কাকিমা ঘাড় ফিরিয়ে মল্লিকাকে ডাকলেন, 'ও মল্লি—শোন, এইবার তোর একজন দেশের লোক পেলি কলকাতায়—একেবারে বাড়ির পাশে।' কাকিমা হাসতে লাগলেন, একটু খাটো গলায় হাত নেড়ে বললেন, 'দেখ বাবা শ্যাম, যতই বলিস আমরা সব এক দেশের লোক, কোলিয়ারির মানুষ। ভূতটুত না কি রে?' আমার শ্যামল নামটাও উনি শ্যাম করে নিয়েছেন। ওই নামেই ডাকেন।

আমি সহাস্যমুখে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলাম। আড়চোখে দেখলাম মল্লিকাকে, মল্লিকা কাঁটা গাছ থেকে হলুদ ফুল তুলছে।

'তোর বোনের আবার কলকাতা ছাড়া ঘুম হয় না। পোড়ার-মুখি বলে কি না এখানে বড্ড ভয় করে।' কাকিমার গলার স্বরে বোঝা যাচ্ছিল, মেয়ের কথাটা তার খুব মনে ধরেছে।

মল্লিকা আমার বোন নয়। তবু সাদামাটাভাবে কাকিমা সরল সম্পর্ক দিয়ে বেঁধে দিলেন। আমার কানে শব্দটা না-ভাল না-মন্দ লাগল। তবু কেমন যেন লজ্জা লজ্জা লাগছিল।

'কলকাতায় গিয়ে একটু মোটাসোটা হবি, কেমন!'

'কার মতন, পেহ্লাদবাবুর মতন?'

'পোড়ারমুখো ছেলে কোথাকার—' কাকিমা আমার গালে আদরের আলতো চড় ঠেকিয়ে হেসে উঠলেন, 'তোরা যা হচ্ছিস দিন দিন, মুখে আর কথা আটকায় না। সেদিন তোর বোন বলে কি জানিস, শুনে হেসে মরি বাবা,...লুচি ভাজছি, আমার ত বাবা জানিসই ময়দা মাখতে এক ঘণ্টা—এমন করে ময়ান দেব মুখে

ফুলোর মতন লাগবে, তার ওপর ঘরের টাটকা ঘিয়ে ভাজা লুচি একেবারে ফুলো ফুলো হয়ে ওঠে। তা একটা লুচি বুঝি বেলতে ছোট হয়েছিল, ভাজার পর সে একেবারে গোল হয়ে ফুলে উঠল। তা একটু বেয়াড়া দেখাচ্ছিল বাপু। আমার বেটাটি ত কিছুতেই খাবে না, তখন মেয়ে বলে কি, টুলু খেয়ে ফেল ওটা পেহ্লাদবাবু-লুচি।...তোর কাকাবাবু বসেছিলেন, শুনে হেসে মরেন।' কাকিমা হাসতে হাসতে একটু ঝুঁকে পড়লেন।

একমুঠো ভেলভেট পোকা কুড়িয়ে টুলু ততক্ষণে উঠে এসেছে। মল্লিকা ভাইয়ের হাত চেপে ধরে ভেলভেট পোকা দেখছে—আকাশের তলায় ক'টা পাখি উড়ছে, চারপাশ ধোওয়া-মোছা, গোধুলির চাপা আলোয় ভরে গেছে বাতাস।

মল্লিকার মুখ সেদিন আরও সুন্দর উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। হালকা বেগুনি রঙের ফ্রকে জড়ানো মোমের বড় পুতুল যেন।

'কবে যাবি তুই কলকাতায়?' কাকিমা শুধোলেন।

'আগামী শনিবার।'

'মল্লি যাবে বুধবার।...তা তুই যাস মাঝে মাঝে ওর কাছে। ভাইবোনে গল্প করবি।'

মল্লিকা ভাইয়ের হাত ধরে এগিয়ে আসছিল। আমার দিকে তাকাল না। আমাদের পাশ কাটিয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছিল। টুলু তার হাত ছাড়িয়ে আমাদের কাছে চলে এল। তাকাল কি না তাকাল আমার দিকে—সাইকেলের ঘণ্টি বাজাতে লাগল।

'ওদের নিয়ে একটু বেড়াতে বেরিয়েছি। ওই খেলার মাঠ পর্যন্ত যাব। যাবি?' কাকিমা আদর করেই ডাকলেন।

যেতে পারতাম। কিন্তু গেলাম না। কেন জানি না মনে হল, মল্লিকা আমায় হ্যাংলা ভাববে। ভাববে তার সঙ্গে ভাব করতে গিয়েছি সেধে সেধে। এ-রকম কেন মনে হয়েছিল জানি না। তবে মনে হয়েছিল। ওই বয়সের মধ্যেই কতকগুলো ধারণা

গড়ে উঠেছিল। মেয়েদের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকা, যেচে যেচে ভাব করতে যাওয়া—এ-সবই অসভ্যতা, হ্যাংলামো।

অসভ্যতা করতে হ্যাংলা হতে কাঙালপনা করতে আমার মাথা কাটা যেত। অহংকারে লাগত। তুমি যেই হও, মল্লিকা কিংবা মাধবী—আমি সেধে তোমার সঙ্গে ভাব করতে যাব না।

'আপনি যান কাকিমা, আমায় বাড়ি গিয়ে কাকার সঙ্গে সেন সাহেবদের বাড়ি যেতে হবে।'

'আচ্ছা, তবে তুই যা। একদিন আসিস না বাড়িতে—শনিবার পর্যন্ত ত আছিস।' টুলুকে টেনে নিয়ে কাকিমা পা বাড়ালেন।

'যাব।' আমি মাথা নাড়লাম, হেলে পড়া সাইকেলটা সোজা করে নিলাম। কাকিমা চলে গেলেন।

সাইকেলে ওঠার আগে মুখ ফিরিয়ে একবার দেখলাম। রেল ফটকের ঢালুটায় কাকিমা, লাইন পেরিয়ে মল্লিকা খানিকটা চলে গেছে। হালকা গোধূলি আলোয়, ধোয়া মাঠঘাটের মধ্যে মল্লিকাকে বেশ দেখাচ্ছিল। ধীরে ধীরে হাঁটছিল ও, টুলু লাফাতে লাফাতে যাচ্ছিল। হঠাৎ কেন যেন মনে হল, মল্লিকা হয়ত এখুনি পিছিয়ে পড়া কাকিমাকে দেখার জন্যে মুখ ফিরিয়ে তাকাবে। আর পিছু চাইলেই আমায় সে দেখতে পাবে। দেখবে, আমি হাঁ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদের দিকে চেয়ে আছি।

ধরা পড়ার ভয়েই যেন সঙ্গে সঙ্গে সাইকেলে উঠে পালালাম। পরে, সাইকেলে ঊর্ধ্বশ্বাসে খানিকটা ছুটে আসার পর মনে হল, আজ যদি রাস্তায় মল্লিকা আমার সঙ্গে কথা বলত বেশ হত। কেন বলল না!

ঠিক জানি না কেন আমার মনে হল, কলকাতায় ফিরে গিয়ে চুপি চুপি মনে রাখব, ভাবব—এমন কিছু আমার থাকল না।

প্রথম পর্ব

কখনো কখনো আমরা নিজের ইচ্ছে মতন কিছু করি না। কোনো অদৃশ্য ইঙ্গিতের অনুসরণ করি। অজ্ঞানে, অন্ধনয়নে। হয়ত এরই নাম ভাগ্য, হয়ত এই অদ্ভুত আশ্চর্য অজ্ঞাত শক্তিই আমাদের অবধারিত একটি ঘটনার কাছে পৌঁছে দেয়। নয়ত, মল্লিকা এবং আমি দীর্ঘকাল পরে আবার পরস্পরের মুখোমুখি এসে দাঁড়াব, এমন হত না। মাঝে মাঝে মনে হয়, কোনো নিষ্ঠুর নাট্যকারের লেখা নাটকের আমরা দুটি চরিত্র, তার নাটকের ছকে আমাদের গল্প পরবর্তী অঙ্কের জন্যে ঠিক করা ছিল। এবং এ-যেন নিশ্চিত ছিল, মল্লিকাকে আমি ভালবাসব।

কখনও কখনও অবাক হয়ে আমি ভেবেছি, তবে কি কৈশোরে যে-মেয়েটিকে ভাল লেগেছিল, যাকে নিতান্ত অবজ্ঞা-অবহেলা করেছি, তবু মনে মনে লালন করেছি—যার চিন্তা আমায় অবসরে স্নিগ্ধ করত এবং মন ভোলানো স্বপ্ন বই যে-মেয়ে আর কিছু ছিল না—সেই মেয়ে,—মল্লিকা একদিন সত্য হয়ে জীবনে দেখা দিক—এই প্রার্থনাই কি করেছি নিত্য! হয়ত করেছি। হয়ত নিজের অজ্ঞাতে এই প্রার্থনার বীজটুকু কোনোদিন রোপণ করেছিলাম। তারপর একদিন সেই প্রার্থনা পূর্ণ হতে দেখে অবাক হয়েছিলাম, বিহ্বল হয়েছিলাম, কারণ কে জানত সেই বীজ বৃক্ষ হবে।

স্থান-কাল-পরিবেশ বদলে মল্লিকার সঙ্গে আবার আমার যখন দেখা হল তখন আমি আর সেই পুরনো আমিতে নেই। সতের বছর বয়সের তরুণটিকে চব্বিশে এসে পৌঁছতে হয়েছে। এই অর্ধযুগের ইতিহাস রোমাঞ্চকর নয় রমণীয়ও নয়। কিছু বা

স্বদোষে, কিছু বা ভ্রমে, খানিকটা মনোবৃত্তির স্বাভাবিক ঝোঁকে, অহংকারে, জেদে, ঘৃণায়, বিরক্তিতে, মোহে অথবা মায়ায় আমি যেন সেই পুরনো আমিকে কোথায় ফেলে রেখে এখানে চলে এসেছিলাম—এই চব্বিশের ক্লান্ত বিরক্তিকর বিষণ্ণ যৌবনে। বাড়িতে সবাই জেনেছিল, নিঃসন্দেহ হয়ে গিয়েছিল, বাড়ির একটি ছেলে নষ্ট হয়ে গেছে।···মধ্যবিত্ত সংসারে একটি ছেলে নষ্ট হয়ে যাওয়া বড় মর্মান্তিক, এ-যেন সেই একটি মেয়ের বালিকা বয়সে সাংঘাতিক বসন্ত রোগে চোখ-মুখ সর্বাঙ্গ নষ্ট হয়ে যাওয়ার মতন। সে থাকে অথচ থাকে না। তার থাকাটা সংসারের কাছে সত্য অথচ পীড়াদায়ক, সম্পর্কময় অথচ অসহ কষ্টকর।

আমার গুরুজনেরা বুঝেছিলেন, কলকাতা আমার মাথা খেয়েছে, বন্ধুরা আমার সর্বনাশ করেছে; আর ওই যে কি বলে যত রাজ্যের নাটক-নভেল পড়ে উচ্ছন্নে গেছি।

উচ্ছন্নে-যাওয়া ছেলেকে নিতান্ত চোখে সওয়া যায় না, অস্বস্তি লাগে, বিরক্তি লাগে—তাই শেষ পর্যন্ত আমায় একটা চাকরি তাঁরা জুটিয়ে দিয়েছিলেন। শুনেছিলাম এ-চাকরি সোনার চাকরি। লেগে থাকতে পারলে উন্নতি, চল্লিশ টাকার কেরানী থেকে চারশো-পাঁচশোর ছোটখাটো অফিসার হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়, বরং হামেশাই ত হচ্ছে লোকে।

চল্লিশ টাকার কেরানীগিরি নিয়ে পড়েছিলাম বেনারসে। একা। হোটেলের ঘরে একটি সরু তক্তপোশ, একটি দেড় হাতের টেবিল আর তালা-খোলা বাক্স। সুখের মধ্যে এই ঘর; আর সঙ্গীর মধ্যে দু-পাঁচখানা বই। ঘরটা আমার ভাল লাগত। ছোট এক ফালি ঘর, সামনে দিয়ে টানা ফালি বারান্দা চলে গেছে। ঘরের সামনে বিরাট অশ্বত্থের একটি ডাল এসে নুয়ে পড়েছিল বারান্দায়। এই অশ্বত্থ শাখার অজস্র পাতা আমার নিরিবিলি সময়টা ভরে দিত।

আমার মনের চেহারাটা সে-সময় আমি নিজেই স্পষ্ট করে যেন দেখতে পেতাম, অনুভব করতাম। অসুস্থ রুগ্ন মানুষের মতন আমার মন শীর্ণ ক্লান্ত নিষ্প্রাণ বলে মনে হত। মনোভার ও বিষণ্ণতায় দিনগুলি যেন আচ্ছন্ন ছিল। নিজের হতাশার চাপা ভারী দীর্ঘশ্বাস আমি শুনতে পেতাম; আর মনে হত, আমার ভাগ্য এখন রেল কোম্পানির পে-বিলে লেখা হয়ে গেছে চিরস্থায়ী ভাবে।

ঠিক এই সময়ে—যখন হতাশায় এবং বিষণ্ণতায় ডুবে আছি—মল্লিকার সঙ্গে দেখা হল। আর দেখা শুধু নয়, পরিচয় হল, ভাব হল—এতকাল যা হয় নি।

আগেই বলেছি স্থান-কাল-পরিবেশের তখন বদল হয়েছে। সেই কোলিয়ারির রাস্তা, বাংলো কি শিশুতলায় আর আমাদের মুখোমুখি দাঁড়াতে হল না। ফাঁকা উধাও মাঠ, ছোট ছোট ছবির মত বাড়ি, পাথরের নুড়ি দিয়ে বাঁধানো রাস্তা, লাল ধুলো আর অজস্র গাছের মনোহর শান্ত পরিবেশে দেখা হল। মাসটা তখন বুঝি কার্তিকের প্রথম।

পুজোর ছুটিতে বাড়ি এসেছিলাম। এই বাড়িই এখন আমাদের পৈতৃক। আধখানা হয়েছে আধখানা হয় নি। যুদ্ধের বাজারে লোহা-সিমেণ্ট আর জুটছিল না। মস্ত বাড়ি ফেঁদে বাড়ির কর্তারা তখন ফাঁপরে পড়েছেন। শনৈ শনৈ এগুচ্ছে কাজ। মল্লিকাদেরও সেই অবস্থা। আমাদের বাড়ির কাছাকাছি জমি কিনেছিল। বাড়ির কাজে হাত দিয়ে অল্পই এগুতে পেরেছে। কোনো রকমে দুটো ক্ষুদে ঘর আর রান্না স্নানের একটু জায়গা করে নিয়ে আপাতত বন্ধ রেখেছে।

পুজোর মরশুমে সবাই এসে জমেছিল। আমরা—আমাদের বাড়ির প্রায় সবাই; মল্লিকাদের বাড়িরও সকলে।···ক'টা দিন মন্দ কাটল না। বরং বলা উচিত, সুখে কাটল, আনন্দে আর হুল্লোড়ে।

পুজো কাটলে কে যেন বলল, চলো একদিন পিকনিক করে আসি নদীর ধার থেকে, সবাই আছি, কে জানে আবার কবে একসঙ্গে জুটবো এসে।

পরের দিনই তিনখানা গোরুর গাড়িতে উনুন কাঠ হাঁড়ি কড়াই শালপাতা চাল ডাল তরিতরকারি বিশ্বসংসার চাপিয়ে যাত্রা শুরু করা হল। যাবার সময় প্রথমেই নীলুদা কাঞ্চনদাকে উদ্দেশ করে গান গেয়েছিল এক কলি ঃ আমাদের যাত্রা হল শুরু, ওগো কর্ণধার···। একটু বেলা হয়ে গেছে, রোদ টলটলে, আকাশ নীল, সবুজ শ্যামল গাছপালা। বাচ্চা-কাচ্চা আর মা-কাকিদের গোরুর গাড়িতে তুলে দিয়ে আমরা—জনা বিশেক হেঁটে চলেছি, ছেলে-মেয়ে একত্রে। স্তব্ধ শান্ত নিঝুম রাস্তাটার গাছগুলো আমাদের গলার স্বরে, চিৎকারে, হাসিতে যেন অবাক হয়ে দেখছিল, এরা কে? এরা কারা?

বড় দলটা থেকে আমি একটু আড়াল নিয়ে হাঁটছিলাম। ওদের অতটা হুল্লোড় দুরন্তপনা চাঞ্চল্যের সঙ্গে যেন ঠিক আমার খাপ খাচ্ছিল না। তা ছাড়া ছোড়দা-টোড়দা ছিল, সিগারেট টিগারেট খাওয়ার অসুবিধে, তাই দল ছাড়া হয়ে একা একা চলেছিলাম।

মল্লিকা, কাজল, লিলি, রেখাদি—এদের দলটাও জোট বেঁধেছে—তবে তারা আলাদা নয়, বড় দলটার সঙ্গে মিশেই চলেছে। ছুটছে, হাসছে, গান গাইছে, কার যেন বাড়ির বাগান থেকে ফুল চুরি করে খোঁপায় গুঁজেছে।

রাস্তা ছেড়ে জঙ্গলের পথ ধরার সময় গোরুর গাড়ি তিনটি থেমে গেল। কাঁঠাল গাছের ঘন ছায়ার তলায় জিরোতে লাগল। একে একে আমরা গিয়ে জড়ো হলাম।

কাঞ্চনদা বলল, 'জঙ্গলের রাস্তা চেনে এমন একজন গোরুর গাড়িতে থাক, আমরা শর্টকাট করে বরাকরে গিয়ে পড়ব।'

রেখাদি বলল, 'তিন-তিনটে গাড়োয়ান আছে—আবার আলাদা গাইড লাগবে কেন ?'

'লাগবে। তিনটে গাড়োয়ানের তিনজনেই যে-যার নিজের পথ চেনাবে—তারপরে দেখবে তিনটেই হয় খানায়-ডোবায় পড়েছে, নয়ত জঙ্গলে পথ হারিয়েছে। এ-দেশের গাড়োয়ানকে তুমি চেন না।'

'নীলু, তুই ত একটা গাড়োয়ান হতে পারিস—' ছোড়দা বলল।

নীলুদা এক পলক কাজলের দিকে চেয়ে ফরসা মুখে টকটকে লজ্জার হাসি হাসল। কাজল রেখাদির আড়ালে মুখ লুকিয়েছে। বোধহয় পরিহাসের অস্বস্তিটা কাটাবার জন্যে নীলুদা আরও একটু চড়া রসিকতা করল, 'আমি একা কেন, এখানে ত তিন গাড়োয়ানই রয়েছে।'

'কে কে ?' রেখাদি শুধালো।

'আমি, কাঞ্চন আর মধু।'

'ফাজিল !'

'কেন, আপনার কর্তাটিকে গাড়োয়ান করা যায় না !'

'যাবে না কেন, তবে সে ত ভাই শুধু ওই বাঁধা গাড়ি হাঁকাবার জন্যে—' কাঞ্চনদা আঙুল দিয়ে রেখাদিকে দেখিয়ে দিল। দলে একটা অট্টহাসির ঢেউ উঠল।

গোরুর গাড়ি থেকে কাকিমা—মল্লিকার মা—মাথা বাড়াল, 'তোরা ছেলেমেয়েরা খালি হা হা করে হাসছিস—আমাদের যে গা-গতর গেল।'

'একটু যাক মাসিমা—পিকনিকটা মনে থাকবে।' ছোড়দা বলল।

'না বাবা, আমার মা'কে তোমরা মের না।' মল্লিকা হেসে হেসে বলল।

মেজ কাকিমা মাথা বাড়িয়ে বলল, 'তোরা থাক্—আমরা নিজেরাই পথ চিনে যেতে পারব।'

কাঞ্চনদা হঠাৎ আমার দিকে তাকাল। বলল 'এই ত শ্যামল রয়েছে, আমাদের সাহিত্যিক। ও কি করে পিকনিকে যাচ্ছে আমাদের সঙ্গে দেখেছ, যেন বানপ্রস্থে যাচ্ছে।'

আবার এক দফা সমস্বরে অট্টহাসি শোনা গেল।

মল্লিকা হাসছিল, কাজল হাসছিল। রেখাদিও।

'ওকেই গাড়িতে তুলে দাও।' নীলুদা বলল।

'আমিও তাই বলছিলাম।' কাঞ্চনদা বলল।

জঙ্গলের রাস্তা আমার চেনা ছিল না। দু একবার গিয়েছি বেড়াতে। বললাম, 'রাস্তা ত আমি চিনি না।'

'চিনতে হবে না তোকে। তুই সামনের গাড়িটায় বসে থাক। খালি দেখবি, এই গোরুর গাড়ির পথ ধরে যেন যায় সব ক'টা—তা হলেই হবে।' কাঞ্চনদা বললে।

কাজল হাসছিল। 'দাদাভাই, তোমারই সুখ। পায়ে কাঁটাটিও ফুটবে না, দিব্যি গোরুর গাড়ি চেপে গড়গড়িয়ে চলে যাবে।'

'আমিও তাহলে শ্যামলদার সঙ্গে যাই।' লিলি বলল। কারণ ইতিমধ্যেই লিলির পায়ে একটা পাথরকুচি ফুটেছে।

'না-না ; আমরা হেঁটে যাব।' রেখাদি বলল, 'তোমাদের সব যেমন, আনন্দ করতে এসেছি না গোরুর গাড়ি চাপতে এসেছি। নাও, চলো বাপু, আর দাঁড়িয়ে থেকো না—ন'টা বুঝি বাজতে চলল।'

আমি গোরুর গাড়িতে উঠলাম। বিরাট দলটা পিছন থেকে আমাদের গাড়ির দুটো গরুকে খেদিয়ে দিল। গাড়িটা মেঠো উঁচুনীচু রুক্ষ পথে টাল খেতে খেতে গড়গড়িয়ে ছুটে চলল। আর দুটোও পিছু নিল।

নীলুদা চেঁচিয়ে বলল, 'শ্যামল, গাড়ি থেকে নেমে একটা উনুন ধরিয়ে দিও, গিয়েই চা খেতে হবে।'

জঙ্গলের রাস্তা দিয়ে গাড়িটা এবার মন্থর গতিতে চলছে। কাঁটাগাছের ঝোপ, শালের চারা, হরিতকী গাছ, দু-একটা বেল মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। বুনো ঝোপঝাড়, মেঠো পথ দিয়ে গাড়িটা চলেছে। তিন গাড়ির চাকার শব্দ এই ফাঁকায় ছড়িয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে পাখি উড়ে যাচ্ছে সরু চিকন ডাক শুনিয়ে। রোদ উথলে পড়েছে চারপাশে। আকাশ ঘন নীল। শান্ত।··· এখানে, এই কার্তিকে শীতের শুরু বুঝি। কোথায় যে সেই স্পর্শ ছিল!

গাড়িতে বসে বসে সিগারেট টানছিলাম। পেছনের গাড়ি থেকে কাকিমাদের কথা মাঝে মাঝে ভেসে আসছিল।

মল্লিকার কথা ভাবছিলাম। সেই পাঁচ ছ' বছর আগে দেখা মল্লিকার সঙ্গে এখনকার মল্লিকার কত না তফাৎ! এখন বোধ হয় ওর বয়স কুড়িতে এসেছে, ফোটা কুঁড়ির মতনই ফুটেছে মল্লিকা। তখন কিশোরী ছিল, সুন্দর ছিল, কাচকড়ার পুতুলের মতন ছিল। গোলগাল সেই চেহারা এখন মাথায় বেড়েছে, একটু কৃশ হয়েছে, মুখের ডৌল আর পুরন্ত নয়, সামান্য গাল উঠেছে, কপাল যেন আরও ছোট হয়ে এসেছে চুলের অজস্রতায়। রোল্ডগোল্ড ফ্রেমের পাতলা চশমার তলায় দুটি চোখ এখন আরও সুন্দর দেখায়!··· এই নতুন মল্লিকা (নব মল্লিকাকে) আমি আজ তিন চার দিন ধরে দেখেছি, বাড়িতে মাঠে পুজোর প্যাণ্ডেলে, গানের আসরে, দশমীর চাঁদের আলোয় বকুলগাছ তলায়।

মনে মনে আমি জঙ্গলের গাছপাতার আড়ালে অদৃশ্য মল্লিকাকে দেখতে পাচ্ছিলাম। পরিহাস-মুখর চঞ্চল বিরাট দলটার সঙ্গে সমান পাল্লায় হেঁটে চলেছে। নীল ডুরে শাড়ি, জংলা ছিটের ব্লাউজ গায়ে, লম্বা পুরু বিনুনিটা ঘাড়ের ওপর ভেঙে পড়েছে, ধবধবে হাতে দুটি মোটা মোটা বালা। পায়ে ধুলো, রোদের তাতে মুখটা আরও লালচে হয়ে উঠেছে, হয়তো কপালে একটু

ঘামের ছিটে।…অলস অন্যমনস্ক চোখে বন-জঙ্গলের প্রসারিত সবুজ পটের দিকে চেয়ে চেয়ে এই নতুন মল্লিকাকে আমি তন্ময় হয়ে দেখছিলাম কল্পনায়। ভাল লাগছিল।

বরাকর নদীর পাড়ে গাছের ছায়ায় পিকনিকের দলটা হট্টগোল তুলেছে। গোরুর গাড়িগুলো খানিকটা দূরে ঘন ছায়ায় রাখা। গোরুগুলো খুলে দেওয়া হয়েছে। জোড়া অশ্বত্থের তলায় উনুন কাঠ হাঁড়ি ডেকচি নামানো। হাত কয়েক দূরে ঘোড়ানিমের ক'টা গাছ পাশাপাশি। জায়গাটা পরিষ্কার করিয়ে পাথর সাজিয়ে কাঠ পাতা পুড়িয়ে এক ডেকচি চা তৈরি করেছে গিন্নিরা। সেই চা নিয়ে কাড়াকাড়ি চলছিল ছেলেমেয়েদের মধ্যে।

একটা কাচের গ্লাস ভরতি করে চা নিয়ে আগেভাগে আমি পালিয়ে এসেছিলাম নদীর পাড়ে। ধনুকের মতন বেঁকে নদীর গায়ে ঢলে পড়েছে একটা গাছ। বড় বড় পাতা। কে জানে কি নাম। জায়গাটায় বেশ ছায়া পড়েছে। পাশে একটা বড় পাথর। সামনে খানিকটা বালি, ভিজে ভিজে, সরু ফালির মতন জল বয়ে চলেছে নদীর, হাত পঁচিশ-ত্রিশ জলের পর আবার বালি—অনেকটা চওড়া—তারপর আসল নদী, বুক-জল হবে হয় ত।… চারদিক খুব উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। রোদ গাঢ় ঘন। বুনো পাখি ডাকছিল কোথায়। একটা ফিঙে নদীর রেখা ধরে উড়ে গেল। আকাশটা গাঢ় নীলের চাঁদোয়া হয়ে ঝুলছে।

বসে বসে আরাম করে চায়ে চুমুক দিচ্ছিলাম—সিগারেট টানছিলাম। ছোটাছুটির আওয়াজে মুখ ফিরিয়ে দেখি মল্লিকা আর লিলি দৌড়ে আসছে। লিলির দৌড় দেখে মনে হয় না ওর পায়ে পাথরকুচি ফুটেছিল। খালি পা। গোড়ালির ওপর শাড়ি তুলে ধরে প্রাণপণে ছুটে আসছে দুজনে।…আমার মনে হল, ওরা

বোধ হয় বাজি রেখে দৌড়চ্ছে, কিংবা একজন অন্যজনকে ধাওয়া করেছে, খুনসুটির ঝগড়া, ছেলেমানুষী।

লিলিই আগে এল। একেবারে গায়ের ওপর এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। কোমরে আঁচল জড়ানো। টিকলো নাকটা ফুলে উঠেছে।···গায়ের ওপর পড়েই লিলি আমার হাত থেকে গ্লাসটা ছোঁ মেরে কেড়ে নিতে গেল। লিলি ঠিক মতন ছোঁ মারতে না পারায় গ্লাসটা বাঁচল, খানিকটা চা আমার কাপড়ে পড়ল।

'আপনি খুব আরামে আছেন, এলেন গাড়িতে চেপে, বসে বসে চা খাচ্ছেন—এদিকে আমরা না পাচ্ছি গ্লাস, না পাচ্ছি চা। দিন, গ্লাস দিন তাড়াতাড়ি।' লিলি হাত বাড়াল।

ততক্ষণে, মল্লিকাও এসে গেছে সামনে। 'কেড়ে নে না, অত কথার দরকার কি!'

লিলি আবার ছোঁ মেরে গ্লাস কাড়ার চেষ্টা করল। পারল না। ততক্ষণে আমি সতর্ক হয়ে গেছি।

'ওখানে ত অনেক মাটির খুরি আছে।' আমি বললাম।

'আহা, নিজে খাবেন গ্লাসে আর আমরা খাব মাটির ভাঁড়ে।' লিলি মাথা ঝাঁকিয়ে ভেঙচি কাটল। 'বলতে লজ্জাও করে না।'

'তবে দাঁড়াও একটু, দিচ্ছি।' এক চুমুকে চা-টুকু শেষ করে ফেললাম।

'এঁটো গ্লাস নেব না, ধুয়ে দিতে হবে।' মল্লিকা বলল।

অগত্যা উঠে ভিজে বালি পেরিয়ে নদীর জলে গ্লাস ধুতে গেলাম। পিছু পিছু ওরা আসছিল। নদীর জলে গ্লাস ধুয়ে ফিরছি, বালির ওপর ওরা দুজনে দাঁড়িয়ে। নিরীহ ভঙ্গিতে। কাছে এসে গ্লাসটা লিলির দিকে বাড়িয়ে ধরতেই আচমকা কে যেন এক মুঠো বালি ছুঁড়ে দিল আমার মুখে। তারপর আবার ক' মুঠো বালি। থমকে গিয়েছিলাম। সেই ফাঁকে হাতের ভরা মুঠো শূন্য করে

আবার ওরা বালি কুড়িয়ে নিয়েছে—ছুঁড়ছে আর হাসছে খিল-খিল করে।

আমার চোখে-মুখে-গলায় বালি ঢুকে গিয়েছিল। বোকার মতন, অন্ধের মতন, হয়তো হাস্যকর ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ছিলাম, ওরা হাসছিল।

'লিলি পালিয়ে আয়—নয়তো এবার উলটো বালি খেতে হবে।' মল্লিকা চিৎকার করে বলল।

আমার হাত থেকে গ্লাসটা ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়েই লিলি ছুটল। তার পিছু পিছু মল্লিকা। ওদের হাসি তখনও শুনতে পাচ্ছিলাম। কিন্তু ভাল করে দেখতে পাচ্ছিলাম না। চশমার কাচ বালিতে ভরে গেছে। চোখেও ঢুকেছে খানিক। করকর করছিল। মুখের মধ্যেও খানিকটা বালি ঢুকে গিয়েছিল, জিব-দাঁত কিরকির করছে, থু থু করছি—গলা-বুকেও ভিজে বালির অস্বস্তি। মাথার চুলেও কোন না দু'এক মুঠো গিয়েছে।

প্রথমটায়, আচমকা আক্রমণে বিমূঢ় হয়ে পড়েছিলাম, পরে বিমূঢ়তা কাটলে হঠাৎ বিশ্রী রাগ মাথায় চড়ে উঠেছিল। একটা কটু কথাও এসেছিল ঠোঁটের আগায়—কিন্তু ততক্ষণে ওরা অনেকটা দূরে পালিয়েছে। এই বাজে রসিকতায় আমার সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছিল।

নদীর জলে চোখমুখ ধুয়ে বাঁচি। জামা-গেঞ্জি খুলে মুছলাম। ভিজে নিংড়ানো রুমালটা চোখে চেপে ধরে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলাম। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগছিল। তখনও চোখে একটু জ্বালা-জ্বালা যে-ভাবটা ছিল সেটা কেটে গেল। পকেট থেকে চশমা বের করে আবার পরলাম।···বালির চর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সামনে তাকিয়ে দেখি কাঞ্চনদা, নীলুদা গায়ের জামা খুলে কাজে লেগেছে। পিকনিকের দলটা ছাড়া ছাড়া ভাবে ছড়ানো। বুড়িরা গাছের ছায়ায় বসে, রেখাদি আর কাজল সতরঞ্চি পেতে পা

ছড়িয়ে শুয়ে পড়েছে, ছোড়দারা রান্নার জল জোটাতে ব্যস্ত, বাচ্চাকাচ্চার দল ছোটাছুটি লাফালাফি করছে। মল্লিকাদের দেখতে পাচ্ছিলাম না। চারপাশে কোথাও ওদের পাত্তা নেই।··· আস্তে আস্তে রাগ আমার পড়ে আসছিল।

বেলা বাড়তে লাগল। নদীর চরের ছায়াঞ্চলে পিকনিকের দলটা যেন বেলার সঙ্গে মাত্রা রেখে তাদের হঠাৎ পাওয়া এই যাযাবরী আনন্দকে আরও ঘন উত্তপ্ত নিবিড় করে তুলতে লাগল। উনুনে ধোঁয়া, হাঁড়ি-ডেকচি চড়ানো, কোথাও তরকারি কোটা হচ্ছে, কোথাও বুঝি পান সাজতে বসেছে মল্লিকারা, লিলি দোলায় দুলছে, কাজল আর নীলুদার মান-অভিমান হয়ে গেল এক-পশলা, রেখাদি কাঞ্চনদার মাথায় পুরু এক গামছা বেঁধে দিয়েছে, চেঁচামেচি হৈচৈ—তারই মধ্যে মধুদার নিশ্চিন্ত নিদ্রা।

এই আনন্দ উত্তেজনা সুখ সারল্য আমায় কখন এক সময় জাদু করে ফেলেছিল। আস্তে আস্তে আমি এই কলরবে উচ্ছ্বাসে আনন্দে মিশে গেছি। এবং হঠাৎ যেন এই সরল সুখ আমায় রোমাঞ্চিত করে তুলেছিল। ফলে পরবর্তী ঘটনাটা সহজে ঘটে গেল। কত সহজে, অবলীলায়, অক্লেশে।

মল্লিকা আর লিলি সঙ্গে করে শাড়ি এনেছিল নদীতে স্নান করবে বলে। স্নান না হলেও কাকস্নান! কাজল চালাক। বলল, 'আমি মুখ-হাত ধোবো।'

ওরা শাড়ি গামছা নিয়ে নদীর দিকে চলে গেল। আমার ওপর তখন ভার পড়েছে দুটো হাতা আর খুন্তি মেজে ধুয়ে নিয়ে যাবার। সেই হাতা-খুন্তির ওজন এবং দৈর্ঘ্য বয়ে নিয়ে যাওয়াই আমার পক্ষে কষ্টকর। তবু বয়ে নিয়ে নদীর যে-দিকটায় অল্প বালি পেরিয়ে জল পাওয়া যাবে সেদিকেই এগুচ্ছিলাম। চোখে পড়ল, সেই ধনুকের মতন নুয়ে-পড়া গাছটার তলায় মল্লিকা

লিলি আর কাজল বসে। পাশে দুটো শাড়ি আর গামছা পড়ে ছিল।

'কোথায় যাচ্ছেন, বাসন মাজতে ?' লিলি হাঁক দিল।

আমি হাত নেড়ে ডাকলাম, 'এস।'

লিলি সত্যিসত্যিই গাছের ছায়া ছেড়ে বালির মধ্যে নেমে পড়ল।

কাছে আসতে আমি শুধোলাম, 'কি, চান করলে না তোমরা ?'

'না। যা জল।'

'ভাল জল ত।'

'ভাল না ছাই, কাদা কাদা জল, তায় আবার বালি ভরতি।'

'মাঝ-নদীতে চলে যাও।'

'ও বাব্বা! সাঁতার জানি না।'

'তবে একটা ঘটি নিয়ে এসে নদীর কাছে বসে জল তুলে তুলে মাথায় ঢালো।' আমি হাসলাম।

'মল্লিকাদি এখন সেই মতলব করছে।'

কথা বলতে বলতে শীর্ণস্রোত জলের কাছে পৌঁছে গিয়ে ছিলাম। হাতা খুন্তি মাজতে হবে, বালি ত অজস্র কিন্তু একটা পাতাটাতাও নেই। পকেট থেকে ভেজা দুমড়োনো রুমালটা বার করতে হল।

লিলি বলল, 'ওমা, রুমাল দিয়ে কি করবেন ?'

'ন্যাতা। এই দিয়েই মাজি।'

লিলি খিলখিল করে হেসে উঠল। বলল, 'বলিহারী বুদ্ধি আপনার।...দাঁড়ান, আমি দুটো পাতা কুড়িয়ে আনছি।'

লিলি পাতা কুড়িয়ে নিয়ে এল, হাতা-খুন্তি মাজা হচ্ছে, গল্প করছি। লিলি অকপটে স্বীকার করছে, তখন বালি ছোঁড়ার বুদ্ধিটা মল্লিকা দিয়েছিল। পরে অবশ্য মল্লিকা বলেছে, না দিলেই

হত, চোখে বোধ হয় বালি ঢুকে গেছে রে, খুব চটবে। আমাদের গল্পের মধ্যে মল্লিকা আর কাজল এসে দাঁড়াল।

'দাদাভাই যে খুব কাজ করছ?' কাজল কেমন যেন দুষ্টুমির হাসি হাসল একটু।

'তোমরা দয়া করে খাবে—তাই।' আমি বললাম।

'আমাদের জন্যে তোমার এত খাটুনি—বাব্বা, সইলে হয়।'

'কি সইবে—?'

'না, মানে এই খাওয়ার সুখ—'

'সইবে। এ ত আর তোর…… .'

'কি?'

'না, কিছু না।'

'তোমার ফাজলামো আমি বুঝি নি, না—?' কাজল চোখ পাকাল।

একটু চুপচাপ। মল্লিকা আর কাজলের চোখে চোখে কিসের যেন কথা হল।

'দুটো হাতা মাজতে তোমরা দুজনে যে দু'ঘণ্টা লাগিয়ে দিলে, দাদাভাই ব্যাপার কি!' কাজল লিলির দিকে এক পলক চাপা চোখে চেয়ে তারপর আমার দিকে চাইল। মল্লিকা হেসে উঠল।

লিলি প্রথমটায় বুঝতে পারে নি, তারপর হঠাৎ যেন বুঝে ফেলল ইঙ্গিতটা। 'এই কাজলদি—!' লিলি কি করবে ঠিক করতে না পেরে হঠাৎ নদীর স্রোতে নেমে জল ছুঁড়তে শুরু করল কাজল আর মল্লিকাকে।

কাজল আর মল্লিকা প্রথমটায় বুঝি জলে ভিজতে রাজী ছিল না। তফাতে সরে গেল। তারপর মল্লিকা কি যেন বলল চেঁচিয়ে, সঙ্গে সঙ্গে ওরা দুজনও হাত কয় তফাতে নদীর জলে নেমে পড়ল। দুপক্ষে জল ছোঁড়াছুঁড়ির খেলা শুরু হল। চলল খানিক।

'তোমরা ভাই অমন করে ছুঁড়ো না—' লিলি অন্য পক্ষের জলে আধ-গা ভিজে গিয়ে শেষে করুণ গলায় বললে, 'বা, আমি একলা, তোমরা দুজন।'

'তোমরাও ত দুজন।' মল্লিকা চেঁচিয়ে জবাব দিল।

'কই, আমি একলা···এই কী হচ্ছে মল্লিকাদি···না না আমি একেবারে চান করে গেলুম···' লিলির চুল মুখ শাড়ি ভিজে সপসপ করছে।

মল্লিকা সমানে আঁজলা করে জল তুলে ছুঁড়ছে। তার হাসি বাতাসে যেন উড়ে উড়ে ভাসছিল।

'আপনি কি হাবাগোবার মতন দাঁড়িয়ে আছেন। নিন না— ওদের আচ্ছা করে ভিজিয়ে দিন না।' লিলি হাত টেনে মুখের জল মুছতে মুছতে বলল আমায়।

'তবে না তুই একলা বলছিলি।' মল্লিকা বললে, 'দিব্যি দুজনে রয়েছিস।'

পরাস্ত লিলি এবার বোধ হয় আরও এক লজ্জা পেয়ে হঠাৎ জল ছেড়ে উঠে পড়ল। তারপর দৌড়ল।

মল্লিকারা হাসতে লাগল।

'চটে গেছে খুব।' কাজল বলল।

'চটুক।'

'না না···কেঁদেই ফেলবে হয় ত।' কাজল একটু দ্বিধাগ্রস্ত। 'আমি যাই, ওকে সামলে দিই গে।' কাজল জল ছেড়ে উঠে পড়ল।

মল্লিকা একটুক্ষণ জলের দিকে চেয়ে থাকল। তারপর আমার দিকে চেয়ে কি ভাবল। হঠাৎ ক' আঁজলা জল আমার দিকে ছুঁড়ে মারল। কেমন একটা ভ্রূকুটি। তারপর কাজলের অনুসরণ করল।

আমার মাথায় তখন কি এক ছেলেমানুষী ভর করেছে।

বালির ওপর পড়ে থাকল হাতা-খুন্তি—আচমকা আমি দৌড় দিলাম ধনুকের মতন নুয়ে-পড়া গাছটার দিকে।

মল্লিকা প্রথমটায় বুঝতে পারে নি। পরে বুঝল। ততক্ষণে ওদের শুকনো শাড়ি আমার হাতে। গাছতলা থেকে কুড়িয়ে নিয়েছি। লিলিরটা লিলিকে জিজ্ঞেস করে দিয়ে দিলাম। মল্লিকার ধবধবে সাদা, ছাপা পাড়-সেলাই শাড়িটা আমার হাতে।

এবার মল্লিকা আমার দিকে ছুটে এল। আমি নদীর জলে নেমে গেলাম। মল্লিকাও জলে নামল। সামনে অনেকগুলো ছোট বড় কালো কালো পাথর। জলে ডুবে আছে খানিক, খানিক ভেসে আছে।

'শাড়ি দাও আমার—' মল্লিকার গোড়ালি জল ঠেলে এগিয়ে আসছিল। আমি পাথরের দিকে চলে যাচ্ছিলাম। এবং এমন একটা ইঙ্গিত দিচ্ছিলাম যাতে বোঝা যায় শাড়িটা নদীর জলে চুবিয়ে দেবার ইচ্ছেটা আমার প্রবল।

মল্লিকার গোড়ালি ছাড়িয়ে আরও খানিকটা জল উঠেছে। কুচি পাথরে পা ঠিক মতন ফেলতে পারছে না। তবু এগিয়ে আসছে। লিলি গাছতলা থেকে চিৎকার করে কি যেন বলছে আমাকে। খুব খুশি।

বড় পাথরের পাশ দিয়ে আমি আরও বেশি জলে চলে গেলাম। মল্লিকার শাড়ির পায়ের দিকটা ভিজে গেছে। ছোট পাথরে পা দিয়ে বড় পাথরটার ওপর হঠাৎ ও বসে পড়ল। এখানে জল আমার হাঁটু পর্যন্ত। ধীর স্রোত পায়ে শিরশির করে লাগছিল। পায়ের তলায় বালি আর নুড়ি।

মল্লিকা পাথরের ওপর বসে শাড়ির পায়ের দিকটা নিঙড়ে গোড়ালি পর্যন্ত টেনে দিল। আমার দিকে সরাসরি চেয়ে থাকল একটু। তারপর বলল, 'আমার শাড়িটা নষ্ট হলে ভাল হবে না।'

'দেখাই যাক্।' আমি বললাম। বোধ হয় নেশার ঘোরে পেয়েছিল আমাকে। এই কার্তিকের তপ্ত রোদ, নির্জনতা, জল আর বালির নেশা কিংবা ঘোর। নয় ত মল্লিকার সঙ্গে এই আমার প্রথম কথা, যে-কথা বলার পর বুক ধক্ করে উঠল, গলার স্বর ফুটল কি ফুটল না, কথা চাপা চাপা শোনাল, সেই কথা কেমন করে বললাম। বলার পর কেন যেন মনে হল, কত কাল ধরে এই সময় এই মুহূর্ত যেন আমার কামনা ছিল।

মল্লিকা তার সোনালী চশমা খুলল, চোখ মুছল, আবার পরল। 'আমার আর শাড়ি নেই।'

'বাড়িতে আছে।' আমি চোখের পলকে কত সাহস সঞ্চয় করে ফেলেছি।

'আহা—! আর এখন আমি কি পরব!' মল্লিকা ভেঙচে উঠল।

'আমি কি জানি!...'

'কি করবে তুমি শাড়ি দিয়ে?'

'জলে চোবাব।'

'ওমা, না...না..., লক্ষীটি তোমার পায়ে পড়ি। এই কাদা-জলে ডুবোলে শাড়িটা একেবারে লাল হয়ে যাবে।' মল্লিকা যেন সর্বনাশের আশঙ্কায় আঁতকে উঠল। 'ও-শাড়ি আর আমি পরতে পারব না।'

'বয়ে গেল আমার।' এবার আমি যেন কৌতুকটা অনুভব করতে পারছিলাম।

মল্লিকা দিশেহারা হয়ে বলল, 'বেশ, আমি মাপ চাইছি।'

'চাইছ?'

'চাইছি—চাইছি—চাইছি। বাব্বা! দাও, শাড়ি দাও।'

শাড়ি ফেরত দিলাম। শাড়ি পেয়ে চোখে শাসন-শাসন ভাব ফোটাল মল্লিকা। 'আমার শাড়ি নষ্ট করলে তোমায় মজাখানা দেখাতাম।'

'ফেরত্ত পেয়ে বীরত্ব!' আমি হাসলাম।

পাথর থেকে নেমে এল মল্লিকা। জল ঠেলে যেতে যেতে হঠাৎ বলল, 'তোমার চোখে সত্যি সত্যি বালি ঢুকেছিল?'

'ঢোকে নি!' আমি সরাসরি চাইলাম। যেন দেখাতে চাইলাম, দেখ, এখনও চোখ কেমন লালচে হয়ে রয়েছে।

মল্লিকা আমার চোখ দেখল না কি সারা মুখ মুখের ভঙ্গি দেখল কে জানে। ঠোঁটে দাঁত বসিয়ে হাসল একটু। বলল, 'যাকগে, এখন ত আর চোখে বালি নেই।' কথাটা বলে আড়-চোখে আমায় দেখল একটু। তারপর জোরে জোরে পা ফেলে জলটুকু পেরোবার চেষ্টা করল।

ছপ্ ছপ্ শব্দ উঠছিল পা ফেলার। এক জোড়া বক উড়ে যাচ্ছে। কেমন একটা মিষ্টি ঠাণ্ডা হাওয়া এখানে, বালি বালি গন্ধ। আকাশটা যেন অনেক দূর থেকে এই নদী, বালি, নির্জনতা আর আমাদের দেখছে।

বালিতে পা দিয়ে মল্লিকা একবারও আর তাকাল না আমার দিকে। সোজা কাজলদের দিকে এগিয়ে গেল।

২.

কখনও কখনও এইরকমই হয়। যা হবার নয়, ভাবা যায় না, হঠাৎ এক অবস্থায় পড়ে সেটা ঘটে যায়; আর আশ্চর্য এই যে, ওই অবস্থা না ঘটলে ঘটনাটা ঘটত না। মল্লিকার সঙ্গে অমন ছেলেমানুষিতে মেতে উঠব, এ আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। অথচ সেদিন সেই পঁচিশ-ত্রিশ জন মানুষের বয়স-হারানো অবাধ আনন্দের স্রোতে শেষ পর্যন্ত ত ভেসেই গেলাম! বানপ্রস্থ যাত্রার যাত্রী বলে যাকে কাঞ্চনদা ঠাট্টা করেছিল, গোরুর গাড়িতে তুলে দিয়েছিল সকালে, বিকেলে কার্তিকের পালাই-পালাই আলোয়

সে বোধ হয় সবচেয়ে জীবন্ত মানুষের মতন বিরাট পিকনিক দলটার নায়ক হয়ে ফিরছিল।

আমি সত্যিই নায়ক হয়ে গিয়েছিলাম—আমার গলা, আমার হাঁটা, আমার হাসি, আগ-বাড়ানো মাতব্বরি থেকে সেটা বোঝা যাচ্ছিল। যদি খুশির ডুব-জলে ওরা পৌঁছে নাও থাকে—আমি নিঃসন্দেহে পৌঁছেছিলাম।

'তোর ভেতরে এত লাইফ আছে কই তা ত জানতাম না রে শ্যামল?' কাঞ্চনদা বলল। বলল তখন, যখন আমরা জঙ্গল পেরিয়ে বাড়ির রাস্তা ধুলোয় লাল করে গোরুর গাড়ির রেস দিতে দিতে ফিরছি। আর আমি প্রথম গাড়ির সারথী। আমার গাড়িতে ছিল, কাঞ্চনদা, মধুদা, লিলি, কালু, পল্টু, আরও যেন কে কে।

মধুদা বলল, 'ও গায়ে একটু রোগা, তা বলে লাইফ থাকবে না কেন! তোমাদের পুজোর প্যাণ্ডেলেই শ্যামল কমটা কি করেছে!'

'আজকের মতন নয়।' কাঞ্চনদা আমার পূর্বকীর্তি স্বীকার করল না।

আশ্রমের জমিটার কাছে এসে আমাদের গাড়ি থামিয়ে দেওয়া হল। পেছনের গাড়ি দুটো এল একে একে। আর এক দফা হুল্লোড়, হাসাহাসি, দুয়ো দেওয়া-দেওয়ি—তারপর একসঙ্গে মিছিল করে পদযাত্রা। তখন বিকেল ডুবে সন্ধ্যের মিহি ঝাপসা অন্ধকার নেমেছে। গাছের মাথায় মাথায় পাখিরা ঝাঁক বেঁধে এসে বসছে, উড়ে যাচ্ছে অন্য গাছে, পাখার ঝাপটানি আর কলরবে রাস্তাটা ভরা।

আমরা সমস্বরে কোরাস গাইতে গাইতে ফিরছিলাম। কাঞ্চনদা সেই মশার গানটা: কানের কাছে গুন গুন করে পরম শত্রু জানিয়ো তায়—এতগুলো দুরন্ত গলার একমাত্র উপযুক্ত গান বলে বিবেচনা করেছিল। অথচ ওখানে দুজন রীতিমত ভাল

গাইয়ে ছিল ঃ কাজল আর মল্লিকা। ওরাও সেই মশার গান গাইছিল, খালি রেখাদি মাঝে মাঝে বলছিল, 'কি হচ্ছে, এটা বাপু লোকালয়, লোকে ভাববে একদল মাতাল-টাতাল চলেছে।'

কখন যেন কার্তিকের মিহি অন্ধকার ধুয়ে গেল, আলো আলো লাগল, জ্যোৎস্না ফুটল, মহাবীর মন্দিরে ঘণ্টা বাজতে লাগল, আর আমরা গাছপালার তলা থেকে হঠাৎ মাঠ-ভরা আলোয় এসে পড়লাম। আকাশে তখন শুক্লা চতুর্দশীর চাঁদ।

সেই চাঁদের দিকে চেয়ে সবাই আমরা কেমন থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

'আহা-হা—খাসা! বিউটিফুল…' মধুদা সোচ্ছ্বাসে বলল।

'কাল যে কোজাগরী পূর্ণিমা।' রেখাদি নরম অভিভূত গলায় মনে করিয়ে দিল।

তারপর এই মাঠে আমরা সকলে ছাড়া-ছাড়া হলাম। সামনেই আমাদের বাড়ি। গোরুর গাড়িগুলো চাকার ক্লান্ত স্বর টেনে-টেনে বাড়ির দিকে চলে গেল। দূরে রেল লাইনে একটা মাল-গাড়ি যাবার আওয়াজ উঠছিল। আমরা সবাই প্রায় চুপ।

একে একে যে যার মতন মাঠে বসল; হাঁটু ভেঙে, গা এলিয়ে। কাঞ্চনদা মধুদা টান টান হয়ে শুয়ে পড়ল ঘাসের ওপর। কে যেন দেশলাই জ্বালল; এক পলকের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, ছোড়দা আর মধুদা সিগারেট ধরিয়ে নিল। নীলুদা অনেকটা তফাতে একা একা বসে। রেখাদি হাঁটু ভেঙে দুহাতের উপর থুতনি রেখে বসে আছে। লিলি আর মল্লিকা আকাশের দিকে চেয়ে এলোমেলো হয়ে বসেছিল। কাজল নিলুদার মতনই একটু আলাদা হয়ে বসে। তার মুখ দেখা যাচ্ছিল না, মনে হল ও আকাশ দেখছে না—দূরান্তের অস্পষ্ট যবনিকার দিকে চেয়ে আছে।

কেউ কোনো কথা বলছিল না। সারাদিনের কলরব স্তব্ধ

শান্ত। এই স্তব্ধতা যেন কেমন। মনে হচ্ছিল, আমরা যেন একদল পাখী, সারাটা দিন মাঠ বন ঘুরে সন্ধ্যার মুহূর্তে নীড়ে ফিরে এসে শান্ত নীরব হয়ে গেছি।

এই নীরবতার মধ্যে কতটা ক্লান্তির নিস্পৃহতা ছিল কে জানে! অবসন্ন হয়ত লাগছিল, :শরীরের মধ্যে একটা ব্যথা অসাড়ত্ব অনুভব করতে পারছিলাম। কিন্তু, এখন এই মুহূর্তে আমি কাঞ্চনদা মধুদা রেখাদি কাজল লিলি এক হয়ে ছিলাম না। আমাদের মিশ্রিত মিলিত সত্তা এখন আর সমবায়ে একই আনন্দ উপভোগ করছিল না। যেন এতক্ষণ, সেই সকাল থেকে এই সন্ধ্যের অল্প একটু আগে পর্যন্ত, সবাই একসাথে একটি দল হয়ে কোন এক সুখের খেলা খেলছিলাম, এখন আর দল নেই, দল ভেঙে গেছে, আমরা সবাই একা একা যে যার মতন বসে আছি। বসে বসে যে যার একান্ত নিজস্ব প্রশান্তিটুকু উপভোগ করছি। এই ঘুমন্ত নীরব মাঠ, চতুর্দশীর স্নিগ্ধ নিবিড় জ্যোৎস্না, ছায়ার মতন অস্পষ্ট দূরান্ত দিকরেখা—যার যার নিজের মনে একটি স্বতন্ত্র অনুভূতি সঞ্চার করছিল।

সুখ এবং বিষণ্ণতা আলোছায়ার মতন আমার মনে মাখানো ছিল। আজকের সারাটা দিনের টুকরো টুকরো স্মৃতি এখন সদ্য তোলা ফুলের একটি স্তবক হয়ে আছে, তার গন্ধে মন আচ্ছন্ন। অথচ এই সুখের মধ্যে কেমন এক চাপা বিষণ্ণতার সুর ভাসছিল। কাল এতক্ষণ কোথায় আমি? পরশু? মল্লিকাই বা কোথায়? কাল পরশু এবং তারপর দীর্ঘ সময়—হয়ত আর আজীবনই আমরা পরস্পবের এত কাছে আর আসব না, কেউ কাউকে দেখতে পাব না। শুধু আজ—একটি দিন কেমন করে যেন ভাগ্যের খেয়ালে পরস্পরের এত কাছাকাছি হয়ে গিয়েছিলাম।

উদাস বিষণ্ণ লাগছিল, ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল। ভবিষ্যতের নিরানন্দ আর প্রাণহীনতা ক্রমশ আমায় অধিকার করছিল।

আমার কোলের কাছে একটা ছোট্ট নুড়ি পড়ল। তাকিয়ে দেখি ক' হাত দূরে মল্লিকা আর কাজল। মল্লিকা এমন ভাবে আকাশের দিকে চেয়ে আছে যেন তার চারপাশে মানুষ-জন কিছু নেই, আকাশটাই আছে, আকাশ আর জ্যোৎস্না আর চাঁদ।

আমি একটা নুড়ি কুড়িয়ে মল্লিকার দিকে ছুঁড়লাম। ছুঁড়ে আকাশ মুখো তাকালাম, যেমনটি করে মল্লিকা তাকিয়েছিল।

এক সময় যখন একে একে মাঠ ছেড়ে বাড়ি ফিরছি, কথা বলতে বলতে, মল্লিকা আমার পাশে এলো।

'এই, ঢিল ছুঁড়ছিলে যে!' খাটো গলায় মল্লিকা বলল।

'তুমিও ত ছুঁড়ছিলে।'

'আমি ছুঁড়ি নি।'

'তবে কে ছুঁড়েছিল—?'

'বারে, আমি কি করে জানব। আমি কি দেখেছি—।' মল্লিকা আড়চোখে তাকাল, কি দেখল কে জানে। হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'তুমি আমার হাত পুড়িয়ে দিয়েছ।...তখন এমন করে গরম খিচুড়ি ঢেলে দিয়েছ হাতে...'

'ইচ্ছে করে দিই নি, পরিবেশণ করতে গিয়ে পড়ে গেছে...।'

মল্লিকা চুপ করে থাকল। একবার ইচ্ছে হল বলি, ফোস্কা পড়ে গেছে নাকি? বললাম না। বরং উলটো চাপ দিতেই ইচ্ছে হল। 'তুমি যে পান খাইয়ে আমার জিব-গাল পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছ।'

'আহা, আমি গাল পুড়িয়ে দিয়েছি!' মল্লিকা রাগ ভাব করল।

'দাও নি?'

মল্লিকা কথা বলল না। মাথা নাড়ল জোরে। তারপর একটু

হেসে বলল, 'যা না জিবের ধার, পুড়ে খানিকটা ভোঁতা হয়েছে—ভালোই হয়েছে।'

বকুলতলা পেরিয়ে আমরা মল্লিকাদের বাড়ির ছোট গেটের কাছে এসে দাঁড়ালাম। একটু চুপচাপ।

'বেশ কাটল আজ, না—!' মল্লিকা আস্তে মোলায়েম গলায় বলল। 'এখন আমার ভীষণ ঘুম পাচ্ছে।'

'যাও, ঘুমোও গে যাও।' আমি হাসলাম, 'আমার আবার জিনিসপত্র গোছান আছে—কাল কর্মস্থল যাত্রা।'

'কাল। কালই যাচ্ছ!' মল্লিকা অবাক হল।

'পরশু জয়েন করতে হবে। চাকরি।'

'আমরা পরশু বিকেলে ফিরব।' মল্লিকা কাঁধে আঁচলটা টেনে নিল, 'কালকের দিনটা থেকে যাও। কোজাগরী পূর্ণিমার দিন আবার কেউ বাড়ি থেকে বেরোয় নাকি। পরশু একসঙ্গে সব যাব।'

'এক সঙ্গে—! তোমরা যাবে একদিকে, আমি অন্যদিকে একেবারে উলটো পথে—'

'ওই হল, অত খুঁত ধরতে হবে না কথার।' মল্লিকা তাদের ছোট্ট গেট খুলে ফেলল, 'কাল তা হলে যাচ্ছ না।'

'চাকরি চলে যাবে না গেলে।'

'উঁ' অত সস্তা…।' মল্লিকা ঘাসের পথ ধরে চলে গেল। জ্যোৎস্নায় ওর সাদা শাড়িটা মিশে গেছে, পাড় না থাকলে হয়তো মানুষটাই মিশে যেত, দেখা যেত না।

কাঞ্চনদা আর মধুদা কথা বলতে বলতে পিছুতে আসছে। কাজল আর নীলুদা ফাঁকা পুজো মণ্ডপটার কাছে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। ছোড়দা কাকে যেন ডাকছে। ইতি-উতি আর ক'জন।

কাঞ্চনদা কাছে আসবার আগেই তাড়াতাড়ি অন্য দিকে পা বাড়ালাম।

সেদিন ঘুম আর আসছিল না। রাত বাড়তে বাড়তে একটা বাজল, রাতের মেল গাড়িটা চলে গেল, চৌকিদারের হাঁক ভাসতে লাগল। এক সময় মনে হল, সব যেন গাঢ় গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে পড়েছে—এমন কি এই বাড়ি, সামনের বাগান, কলাগাছের ঝোপ, শিরীষ গাছ সব, সমস্ত। জ্যোৎস্নার কেমন ঝিমঝিমে আচ্ছন্নতা। মাঠ-ঘাট গাছপালা বাতাস সব যেন এই আলোয় ডুবে আছে। আমার চোখ জ্বালা করছিল না, মাথায় অস্বস্তি হচ্ছিল না—বরং মনে হচ্ছিল, যেন আমার চোখের পাতার তলায়—আজকের সারাটা দিন ছোটাছুটি করছে। মল্লিকা—মল্লিকা—মল্লিকা। চোখ জুড়ে মল্লিকা, মন জুড়ে মল্লিকা। আমের গাছে বোল ধরার মতন মনে আজ মল্লিকার বোল ধরেছে। এ-সুখ ঘুমকে তলায় ফেলে ছাপিয়ে উঠেছে।

মল্লিকাও কি ঘুমিয়ে আছে না জেগে আছে—আমি কয়েক-বারই ভাববার চেষ্টা করলাম। হয়তো জেগে নেই। হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে। হয়তো ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বরাকর নদীর বালীর চরে ছুটছে, ছোটার স্বপ্ন দেখছে।

৩.

সকালে ঘুম ভাঙতে মনে হল, বেলা যেন অনেক হয়েছে। বিছানার অর্ধেকটা রোদে-ভরা, ঘরে আর কেউ নেই। এলো-মেলো বিছানা পড়ে আছে।

বাইরে আসতে দেখি, কুয়াতলার কাছে ভাইবোনদের বিরাট জটলা। ওদের চেহারা বেশবাস দেখে বুঝতে পারলাম, ওদের সকাল হয়েছে অনেক আগেই।

'ঘুম ভাঙল তোমার!' কাজল বলল।

'এরা সব যাচ্ছে কোথায় রে?' আমি শুধোলাম।

'স্টেশন। মাছ কিনতে।'

'দঙ্গল মিলে ?'

'আমাদের বাড়িতে দঙ্গল না হয়ে কোন কাজটা হয় ?' কাজল হাসল।

'বাব্বা, ক' মণ মাছ আনবে !' আমি ব্রাশে খানিকটা পেস্ট নিলাম।

মণ্টু বারান্দা থেকে ছোড়দাকে ডাকছিল। হাতে টাকা। কর্তাদের কাছ থেকে নিয়ে এসেছে।

'চা-টা হবে ত রে, নাকি ওন্‌লি ফিশ ?' ছোড়দা জানতে চাইল।

'হবে।'

ওরা চলে গেল। যাবার সময় বীরু আমায় বলল, 'তুমি মুখ-টুখ ধুয়ে চলে এস—আমরা এগুচ্ছি।'

কাজল জল ঢেলে দিচ্ছিল হাতে, আমি মুখ ধুচ্ছিলাম।

'তুমি আজ যাচ্ছ না ?' কাজল আচমকা শুধলো।

কথাটা কেমন যেন লাগল কানে। কাজলের দিকে তাকালাম। মুখ দেখে মনে হল না কোনো ইঙ্গিত আছে।

'তোকে কে বলল যাচ্ছি না !'

'কেন, তুমিই ত কাল রাত্রে খেতে খেতে বলছিলে।'

এক আঁজলা জল নিয়ে চোখে ঝাপটা দিলাম। কপাল চোখ বেশ ঠাণ্ডা লাগছিল, আরাম অনুভব করছিলাম। 'ভাবছি আজ থেকেই যাই।' কুয়োপাড় থেকে চশমাটা উঠিয়ে নিয়ে চোখে দিলাম।

কাজল কিছু বলল না।

'এই, যাবি নাকি স্টেশনে ?' আমি শুধোলাম।

'আমার ত দেরি হবে একটু। একেবারে চান করে নেব—নয়ত বেলায় বাথরুমে আর জল পাওয়া যাবে না।'

'তোর বাথরুমে ঢোকা মানে ত এক ঘণ্টা।'

'তাড়াতাড়ি নেব।'

'নে তবে, আমি চা খেয়ে মার সঙ্গে দুটো কথা সেরে নি।'

কাজলের 'এই ত হল' করতে করতে ঘণ্টা খানেকই লাগল। বেরুতে বেরুতে আরও একটু বেলা বাড়ল।

গেটের বাইরে এসে কাজল বলল, 'কি ঠিক করলে, সত্যিই যাবে না ত?'

'না। কিচ্ছু গোছগাছ হয় নি। কালই যাব।'

'তুমি দাদাভাই, এবার ভাইফোঁটার সময় এসো না! অনেক কাল তোমায় আর ফোঁটা দেওয়া হয় না।' কাজল একটু ক্ষুণ্ণ স্বরেই বলল।

'জমিয়ে রাখ, একবার এসে একসঙ্গে সব নিয়ে নেব'। হাসতে হাসতে বললাম। না বলে উপায় ছিল না।

জামতলা পেরিয়ে খানিকটা এগুতেই মল্লিকাদের বাড়ি। টুলু বাচ্চু খোকনরা খেলা করছে। জানলাগুলো খোলা। কাউকে দেখা যাচ্ছিল না।

'তোর বন্ধু কাল খুব এক চোট দেখাল।' সকৌতুকে সহাস্যে কথাটা বলতে গিয়েছিলাম, অনেকটা নৈর্ব্যক্তিক ভাবেই, হয়ত ঠিক সুর উঠল না। কাজলের চোখ আমার চোখে এসে স্থির হল। আচমকা কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করে অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে নিলাম।

ভাইবোনে পাশাপাশি কয়েক পা এগিয়ে এলাম। শেষে কাজলই কথা বলল, চাপা হাসি হেসে, 'ডাকব?'

'ডাকবি—কাকে ডাকবি!' বোকা বোকা ভান আমার।

'ওকে।'

'তাই বল।···তুই কি আমায় জুজুর ভয় দেখাচ্ছিস?' আমি জোরে হেসে উঠলাম।

কাজল হাসিটা গ্রাহ্য করল না বলল, 'বল ত ডাকি, নয়ত অর্ধেক রাস্তা গিয়ে তখন বলবে ডাকলি না ভাই…'

'সে বান্দা আমি নই।'

'সব বান্দাকেই দেখলাম।' কাজল হাসছিল।

'দেখার মধ্যে ত ওই একটাই দেখেছিস—নীলমণিলতা।'

'লতা পাতা ফুল সবই দেখেছি।' কাজল ঠোক্করটার পালটা জবাব দিল। ফুল শব্দটা একটু আলাদা অর্থবহ করে উচ্চারণ করল।

একটুক্ষণ চুপ করে থাকতে হল। কাজলটা আজকাল বড্ড কথা শিখে গেছে। 'তোর নীলুদা তোকে বুঝি এইসব বটানি শেখাচ্ছে?'

'শেখাবার কিছু নেই, চোখ থাকলেই শেখা যায়।' কাজল মল্লিকাদের বাড়ির দিকে পা বাড়াল।

'বাব্বা, তোর আজকাল এত চোখ। অনেক দূরের জিনিসও দেখতে পাস দেখছি।' মজা করে করে বললাম আমি। একটা সিগারেটও ধরিয়ে নিলাম।

'তা পাই। মল্লিকাদের গেটের কাছে এসে থামল কাজল, তাকাল, 'তুমি যাবে, না কি আমি ডেকে আনব। তুমি গেলে কাকিমা এখুনি গল্প ফেঁদে বসবে।'

'তুই যা, আমি আছি এখানে। দেরি করিস না।'

কাজল হাসতে হাসতে গেট খুলে চলে গেল।

বকুলতায় দাঁড়িয়ে থাকলাম। রোদ গাঢ়-সিঁদুর রঙ ধরেছে। সামনের মাঠে ইঁটের পাঁজার পাশে গোরুর গাড়ি দাঁড় করানো। হয়ত কাল ওই গাড়িটাতে চেপে আমরা এই সময় জঙ্গলের পথে চলেছিলাম। আজ আমি এখানে, গাড়িটা ইঁটের পাঁজা থেকে ইঁট বইছে, কাঞ্চনদা তার কাজে মত্ত, রেখাদি রান্নাঘরে, মল্লিকা তার নিজের বাড়িতে, নীলুদা অফিসে। আমরা আজ একত্রে

নেই, একসঙ্গে এক জায়গায় মিলিত নই। আজ সবাই বিচ্ছিন্ন, স্বতন্ত্র। কাল বুঝি অসম্ভব কিছু ঘটেছিল, যা কদাচিত ঘটে, যা আকস্মিক। পাঁচ যন্ত্রে পাঁচ সুর নয়, একটি সুর বেজেছিল, ঐকতান। আজ যে যার, যার যেমন নিজের সুর…! হঠাৎ আমার মনে হল, আজ আর কালকের মতন কিছু ঘটবে না। মল্লিকা আসবে না, মল্লিকা বালি ছুঁড়বে না, জল ছুঁড়ে ভিজিয়ে দেবে না, কলহাস্যে দৌড়বে না, হয়ত আর কথাও বলবে না।

মন কেমন ভার হয়ে এল, যেন মেঘলা হল। রোদ মাঠ গাছ ছায়া কিছুই যেন তেমন করে চোখে পড়ছিল না। অন্যমনস্ক। মাথা হেঁট। বকুলতলায় দুটো পালক পড়ে আছে, ছাই ছাই রঙ পালক। পায়রার পালক।

কাজল ফিরে আসছিল। একা। ফাঁকা ফাঁকা দেখাচ্ছিল ও-দিকটা। মল্লিকা এল না।

'ও এখন সবে চান করতে ঢুকল।' কাজল গেট পেরিয়ে কাছে এসে বলল।

'এতক্ষণ কি করছিলি তবে?' ঈষৎ বিরক্ত বোধ করছিলাম আমি।

'কথা বলছিলাম।'

'যেখানে যাস সেখানেই তোদের খানিকটা গল্প করা চাই—'

'মল্লিকা প্রথমে আসতেই চাইছিল। দাঁড়াতে বলল। তারপর কাকিমার কিসের কি পুজো তাই আর বেরুতে পারল না। চান করে এখন সেই পুজো সারতে হবে।'

তবে এই নয় যে, মল্লিকা আসতে চায় নি। চেয়েছিল, কিন্তু পুজো আছে তার—মার পুজো…। অন্যমনস্ক চোখে কাজলের দিকে তাকালাম, 'তোরা যে সবাই ধর্মরাজ হয়ে উঠলি। কি পুজো করতে বসল আজ! লক্ষ্মী—?'

'উঁহু, লক্ষ্মীর পুজো পরে হবে—এখন বাড়ির শিব : ও যে শিব পুজো করে।'

'তোর আর শিবের দরকার-টরকার হয় না, না—? শিব ত সেট্‌লড্‌...' কাজলের মুখের দিকে চেয়ে হেসে উঠলাম। মনের বিরক্তি কেটে গেছে।

'মল্লিকার ত সেটেল্‌ হয় নি—!' কাজল আমার চোখে চোখে তাকিয়ে ইঙ্গিতময় হাসি হাসল।...কয়েক পা হেঁটে এসে বলল, 'তুমি আজ চলে যাচ্ছ কি না জিজ্ঞেস করছিল।' কাজল হঠাৎ চুপ করে গেল। খানিকটা পথ আর কথা হল না। চুপচাপ হেঁটে চললাম।

'কাজল !'

'কি ?'

'ঠাট্টা না করিস ত একটা কথা জিজ্ঞেস করি।'

'বল, ঠাট্টা করব কেন ?'

খানিকটা ইতস্তত করে প্রায় পরিহাসের গলায় বললাম, 'তোর বন্ধু কাল হঠাৎ আমার সঙ্গে ভাব পাতালো যে—!'

হাসপাতালের তেঁতুল আর কাঁঠাল গাছগুলোর ছায়া পেরিয়ে আমরা স্টেশনের রাস্তার কাছে এসে পড়েছি। বাঁ দিকে বড় পুকুরটার জল দেখা যাচ্ছিল, ধুধু মাঠ ও-দিকটায়। কোথায় যেন ঘুঘু ডাকছে। কাজল চুপ।

'কি রে ?' আমি তাগাদা দেবার মতন করে বললাম, 'বলছিস না যে।'

'আমি কি বলব !'

'না, মানে তোর কি মনে হয়।...হঠাৎ এত ইনটেমিসি দেখাল কি না, তাই বলছি।' কাজলের মুখের দিকে চেয়ে থাকলাম সাগ্রহে।

'তোমার সঙ্গে ত ভাব ছিল না, তাই হয়ত।' কাজল হাতে

আঁচল উঠিয়ে ঘোমটার মতন ... ছায়া পড়ল। দুশ্চিন্তার
বেচারীর।

'কি যে বলিস, নতুন নতু ... হাঁটতে লাগলাম।
বাধো লাগে।' ... রে তুলছিল।

'তোমাদের ভাব নতুন নয়।

'নতুন না—!'

'না। কত কাল ধরে দেখছ
বলতে না। ও-ও এক রকমের
হাসতে লাগল।

কি একটা আপত্তি করতে যাচ্ছিলাম, গলায় এসেও কথাটা মুখে এল না। বোবার মতন হাঁটতে লাগলাম।

স্টেশনের পাথর আর ধুলো-ভরা রাস্তায় উঠে মনে হল, কে জানে কাজল হয়ত ঠিক কথাই বলেছে। হয়ত এই হঠাৎ ভাবের তলায় আমাদের এক-রকমের ভাব ছিল, যে-ভাব দুজনকে ধীরে ধীরে এখানে নিয়ে এসেছে।

আরও একটু হেঁটে এসে মনে হল, আমি আজ ভীষণ স্বার্থপরের মতন ব্যবহার করছি। মল্লিকা মল্লিকা করে এতখানি পথ কাটল, কই কাজলের কথা ত কিছু শুধোচ্ছি না। অথচ তার মনের কথা শোনার লোক একমাত্র আমি।

'তোদের কি হল?' কাজলকে শুধোলাম।

'কিসের—?' কাজল বোকা সাজার ভান করল।

'কিসের—, ন্যাকামি করছিস! তোর নীলমণিলতা কি বলছে?'

'জানি না।' কাজল মাথার কাপড় সরিয়ে ফেলল। হুইসল দিতে দিতে একটা মালগাড়ি চলে যাচ্ছে। শব্দটা আমাদের অল্পক্ষণ আর কথা বলতে দিল না।

চারপাশ শান্ত হলে আবার বললাম, 'তোর নীলমণিলতার কথা তুই জানবি না ত কে জানবে!'

'তুমি গিয়ে জিজ্ঞেস করো না।'

'আমায় বলবে কেন?'

'আমাকেই বা বলেছে তুমি জানছ কি করে?'

'বাজে বকিস না। কাল চান্স্ পেলেই ত ছুটিতে একসঙ্গে হয়ে দিব্যি গল্প করছিলি।'

কাজল এক পলক আমার দিকে তাকাল। হাসল একটু। বলল, 'চান্স্ কি শুধু আমরা পাচ্ছিলাম। আর তুমি—তোমরা?'

'আমরা—আমরা আবার কি? আমরা কি তোদের মতন নাকি!'

'তোমরাও সেই। সবাই মক্কা চলেছে।' কাজল খিলখিল করে হেসে উঠল।

আমিও হাসলাম। 'এটা তোকে নিশ্চয়ই নীলুদা শিখিয়েছে।'

'বেশ ত শিখিয়েছে। কি হল তাতে?'

'কিছু না। তোরা এক্সপিরিয়ান্সড্ হ্যাণ্ড, ভালো বুঝিস সব।' আমি হেসে উঠলাম।

কাজল যেন হঠাৎ কেমন লজ্জা পেয়ে গেল।

স্টেশনের ওভারব্রিজে উঠতে উঠতে বললাম, 'তোদের বিয়েটা এবার লাগিয়ে দিলে হয়।'

দু ধাপ সিঁড়ি ভাঙল কাজল। 'কে লাগাবে, তুমি?' হাসিমুখে তাকাল।

'আমি কেন, আমরাই লাগাব। দাঁড়া, আজ খেতে বসে গিন্নিদের কাছে কথাটা তুলব।'

'সর্বনাশ!' কাজল সন্ত্রস্ত ভঙ্গি করে সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে পড়ল। নিষেধের চোখে তাকাল আমার দিকে, মাথা নাড়ল, রক্ষে কর দাদাভাই, তোমায় আর বোনের হয়ে উপকার করতে হবে না।'

পরস্পরের মুখে আমরা তাকিয়ে থাকলাম দু পলক। সিঁড়ি ভেঙে উঠতে উঠতে বললাম, 'বিয়ে ত করবিই তুই ওকে—তবে?'

কাজলের মুখে কেমন অন্যমনস্কতার ছায়া পড়ল। দুশ্চিন্তায় মুখখানা গম্ভীর হয়ে এল। নীরব থাকল ও।

দু জনেই চুপচাপ। ওভারব্রিজের ওপর দিয়ে হাঁটতে লাগলাম। কাজলের এই আকস্মিক গাম্ভীর্য আমায় যেন বিব্রত করে তুলছিল। বললাম, 'কথা বলছিস না যে—!'

'কি ?'

'বিয়ে করবি না ?'

'বিয়েটা কি আমার হাতে ?' ক্ষুব্ধ মৃদু স্বর কাজলের।

আপ প্লাটফর্মের সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়ালাম আমরা। কাজলের এই হতাশ হতাশ মন গুমরোনো ভাবটা আমার ভাল লাগছিল না। এই নিস্পৃহ নিরুদ্যম দুর্বল ভঙ্গিটা আমার মনঃপূত হচ্ছিল না। 'তোদের এই সব হেঁয়ালি আমার ভাল লাগে না। প্রেম করব বিয়ে করব না—একে আমি প্রেমই বলি না। সাহস শক্তি না থাকলে প্রেম করাই বা কেন ?'

কাজল চুপ। আপ প্লাটফর্মের সিঁড়ি দিয়ে অন্যমনস্ক ভাবে আমরা নামতে লাগলাম। স্টেশনের টি স্টলটা দেখা যাচ্ছিল।

'ভালবাসা শখের জিনিস নয়'—ঈষৎ উত্তেজিত গলায় আমি বললাম সিঁড়ি নামতে নামতে। 'তোদের মনটাই এমন হয়ে গেছে, খানিক মিশলাম হাসলাম ভাবলাম আর ভালবাসার সাধ ঘুচে গেল। একটু পুড়তে হয় বাপু, না পুড়লে হয় না।'

'তুমি পুড়ো—' কাজল আচমকা আমার দিকে চেয়ে বলল। হাসল সকৌতুকে। 'পুড়ে পুড়ে···কি বলে···সোনা হয়ো দাদাভাই। আমার আর পুড়ে দরকার নেই।' তরল স্নিগ্ধ গলায় বলল কাজল।

ক' মুহূর্ত আগে যে কাজল অন্যমনস্ক গম্ভীর ক্ষুব্ধ হতাশ হয়ে পড়েছিল—সেই কাজল আচমকা এত তরল হল কি করে আমি বুঝতে পারছিলাম না। ও যেন আমায় পরিহাস করল। অথচ

কাজলের মুখে তার তারল্যের তলায় কেমন একটা বয়স্কতা ছিল, দৃষ্টির আড়ালে, চাপা ঠোঁটের ভঙ্গিতে একটা দৃঢ় নিশ্চিন্ত উদ্দেশ্য ছিল। ওর মুখের দিকে চেয়ে এখন, এই মুহূর্তে, নিজেকে আমার ছেলেমানুষ লাগছিল।

'তুই ভাবলি তোকে আমি লেকচার দিচ্ছি'—যেন লজ্জা কাটাতে বললাম কথাটা।

'উঁহু...' মাথা নাড়ল কাজল। 'লেকচার ভাবব কেন, এ একেবারে তোমার মনের কথা।' কাজল হেসে উঠল।

'কথায় কথায় তোরা এমন হাসিস—' বিব্রত বোধ করলাম, না কি কাজলের কাছে বোধ হয় হেরে গিয়ে আড়ষ্ট হলাম।

স্টেশনের পশ্চিম প্রান্তে ছোট্ট টি স্টল। গোল ঘরের মতন একটু ঘর। দু পাশে কৃষ্ণচূড়ার গাছ। গাছের তলায় বেঞ্চ পাতা। কাজল ছায়ায় মাথা রেখে বেঞ্চে বসল। চায়ের কথা বলে এসে আমিও বসলাম। সিগারেট ধরালাম একটা। ডাউন প্লাটফর্মে লাল মোরেমের গায়ে যেন উজ্জ্বল গাঢ় রোদের ঘন সর পড়েছে। হাওয়ায় করবী ঝোপ দুলছে। লাইনে নেমে কয়লা কুড়োচ্ছে দূরে ক'টা দেহাতী মেয়ে। একটা কালো ভোমরা আমাদের মাথার ওপর বার কয়েক পাক দিয়ে উড়ে গেল। কানের কাছে সেই গুঞ্জনটা আর মেলাচ্ছিল না।

চা দিয়ে গেছে স্টলের ছোকরাটা। চা খেতে খেতে আমরা দু জনেই ও-পাশের প্লাটফর্ম, লাইন, ওয়াটার ট্যাংক, আকাশ আর রোদের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। চুপচাপ। একটা ট্রলি চলে গেল। তার গুনগুন শব্দটা মিলিয়ে যাবার পর মনে হল সেই ভোমরাটা বুঝি আবার মাথার ওপর পাক দিয়ে দূরে কোথায় চলে গেছে।

'কাল এতক্ষণ আমরা নদীতে পৌঁছে গেছি'—কাজল বলল। সুখ স্মৃতির ঈষৎ আবেশ তার গলায়।

গতকালের একটা খণ্ড স্মৃতি যেন আমার মনের জানলার পাশ দিয়ে মুখ বাড়িয়ে চলে গেল। হয়ত এই সময়টায় লিলি আর মল্লিকা আমার চায়ের গ্লাস কেড়ে নেবার জন্য ছুটে আসছিল।

'আগামী কাল তুমি এতক্ষণ ট্রেনে।' কাজল নিশ্বাস ফেলে বলল।

'সুখ—' ওপাশের প্লাটফর্মের দিকে চেয়ে বিষন্ন কণ্ঠে আমি বললাম, 'সুখ জিনিসটা আমাদের কপালে বেশিক্ষণ থাকে না। দেখতে দেখতে ফুরিয়ে যায়।···অথচ দেখ, দুঃখটা আর কিছুতেই যেতে চায় না—। একটা পাখি অন্যটা পাথর রে।'

কাজল অল্প একটু ঘাড় নোয়াল। যেন বলল, হ্যাঁ ঠিক বলেছ, সুখ পাখি দুঃখ পাথর।

অল্পক্ষণ নীরব থেকে কাজল মৃদু গলায় বলল, 'এবারে কাশী ফিরে গিয়ে তোমার খুব খারাপ লাগবে।'

'বরাবরই লাগে।'

'এবারে আরও একটু বেশী লাগবে।' কাজল ঠোঁট টিপে হাসল।

'তোর বন্ধুর জন্যে ?' কাজলের দুষ্টুমি ভরা মুখের দিকে চেয়ে আমি হাসলাম। 'দূর···, কোথায় কি তার ঠিক নেই···। ঠাট্টা ঠাট্টাই, তার বেশী বাপু বাড়াস না।'

কাজল চোখ দুটো এমন বড় বড় করে তাকাল যেন কত না অবাক হয়ে বলছে, তাই নাকি !

দুপুরে কখন এক পশলা বৃষ্টি নামল। পশ্চিমের ঘরে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। খোলা জানলা দিয়ে জামগাছের পাতায় বৃষ্টি আর বাতাসের নাচনটা বুঝি আধো ঘুমে দেখতে দেখতে আবার ঘুমিয়ে পড়লাম।······পুরোপুরি স্বপ্নটা দেখা হল না, ঘুম ভাঙল।

জামগাছের পাতায় তখন পড়ন্ত বিকেলের রোদ আবার কাঁথা বুনছে।

স্বপ্নটা কিছুতেই আর পুরোপুরি মনে করতে পারলাম না। অস্পষ্ট ভাবে শুধু সেই ক্ষেতের আল পথটা মনে পড়ছিল। খেজুর গাছের তলা দিয়ে আল পথ। মল্লিকার পাশে পাশে হেঁটে যাচ্ছি। পাশে সবুজ ধানের মাথা দুলছে হাওয়ায় হাওয়ায়, ঢেউ খেলে যাচ্ছে, কেমন একটু মেঘলা মেঘলা চারপাশ। আচমকা মল্লিকা আমার হাত ধরে ফেলল ভয়ে। সাপ—সাপ! মল্লিকা গায়ের পাশে ঘন হয়ে এল। আমি সাপ দেখতে পাচ্ছিলাম না। মল্লিকার ভয় আমার শরীরকেও কাঁপাচ্ছিল।···সাপ কোথাও ছিল না। কোথাও নয়।

ঘুম ভেঙে মনে হল সেই আলের পথটা যেন আগে কবে দেখেছি। কবে যেন।

সেদিন কোজাগরী পূর্ণিমায় জ্যোৎস্নার কোটাল ডেকেছিল। পথ ঘাট-মাঠ সেই উজ্জ্বল দুগ্ধধবল জ্যেৎস্নায় স্নিগ্ধ শান্ত মনোহর হয়ে ছিল। আর আমরা—বড়রা মাঠঘাট পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। শালবনের দিক থেকে ঠাণ্ডা শীত শীত বাতাস আসছিল। এই ভরা আচ্ছন্ন-করা পূর্ণিমার আলোয় সকলেই কেমন মুগ্ধ বিমোহিত ছিলাম। মাঠে বসে ওরা গান গাইল—কাজল মল্লিকা; ছোট ছোট দলে মৃদু গলায় আমরা কথা বললাম, হয়তো কথা থেমে গেলে নীরবে বসে বসে শান্ত নির্জন নিস্তব্ধ জ্যোৎস্না-ডোবা এই পরিবেশটা উপভোগ করলাম।

মল্লিকার কোথাও আজ গতকালের চাঞ্চল্য ছিল না। শান্ত ধীর এত নিরীহ নম্র দেখাচ্ছিল যে মনেই হয় না এই মেয়ে কোন কালে অমন ছেলেমানুষি করতে পারে—কাল যা করেছে।

কাজলের পাশে পাশেই ছিল। মৃদু গলায় কথা বলছিল, কখনো-সখনো হাসছিল অল্প ঢেউ তুলে চিকন গলায়।

আমার সঙ্গে সরাসরি মল্লিকা একটা কথাও বলছিল না। আমিও বলতে পারছিলাম না! অথচ বুঝতে পারছিলাম, আমি ওকে সর্বক্ষণ লক্ষ্য করছি, ওর প্রায় সব কথাই শোনার চেষ্টা করছি। আমার কান মন ওর দিকেই পড়ে আছে। এই জ্যোৎস্না নীরবতা ঝিঁঝি রব শীত শীত বাতাস এত ভাল লাগত না যদি না ও পাশে কোথাও থাকত আমার, যদি না ওকে দেখতে পেতাম, ওর উপস্থিতি অনুভব করতে না পারতাম।

আমি যেমনটি অনুভব করছি, এই ভাল লাগা এই সুখ, এই সুখের আড়ালে লুকনো বিষণ্ণতা—মল্লিকা তেমনটি অনুভব করছিল কি না বুঝতে পারছিলাম না। তার চোখ তার মন আমার দিকে ছিল কি না, আমি বুঝতে পারছিলাম না।

ফেরার পথে এক সময় মল্লিকা আমার পাশে এল।

'কালই যাচ্ছ তা হলে?'

'হ্যাঁ। তোমরাও তো যাচ্ছ?'

একটু চুপচাপ। মল্লিকার মুখ মোমের মতন মসৃণ নরম।

'আজ সারাটা দিন পুজো করেই কাটালে নাকি?' তরল পরিহাসের সুরে বললাম। বলার মতন কোনো কথা আমার মনে পড়ছিল না।

'কে বলল তোমায়?'

'কাজল।'

'বড্ড বানিয়ে বানিয়ে বলে ও। সকালে মা-র হয়ে পুজোটা করে দিয়েছি।'

'তুমিও ত পুজো করো।'

'বেশ ত করি। হয়েছে কি! তোমার মতন সবাই হবে নাকি।'

'আমার মতন—মানে? আমি কি?'

'তুমি নাস্তিক। ঠাকুর দেবতা মান না।'

'কে বলল?'

'বলবে আবার কে, আমার চোখ নেই।' মল্লিকা ঘাড় ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকাল, তারপর যেন পুরোনো স্মৃতি মনে করতে করতে বলল, 'বিসর্জনের দিন পুকুরের কাছে যখন ঠাকুর নামাল, সবাই প্রণাম করল, পিদ্দিমের তাত নিল, তুমি ত কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে। এমন অভক্তি…' মল্লিকা ক্ষুব্ধ স্বরে বলল।

মল্লিকা এত সব লক্ষ্য করেছে আমি স্বপ্নেও ভাবি নি। অবাক হচ্ছিলাম। কেন যেন খুশী খুশী লাগছিল। আমায় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কেন ও লক্ষ্য করল?

'তুমি আবার কখন ছুটি পাবে?'

'এক্সমাসে কয়েকটা দিন পাওয়া যায়।'

মল্লিকা আর কোন কথা বলল না। শীত শীত বাতাস বইছে। গায়ের আঁচলটা ঘন করে জড়িয়ে নিল। শুকনো কাশি এসেছিল গলায় ওর। মুখে আঁচলের চাপা দিয়ে কাশল কবার।

তেঁতুল ঝোপের ছায়ায় আমরা আড়াল পড়ে গেলাম। অন্ধকারে নিঃশব্দে আমরা হয়তো আরও একটু ঘন হয়ে পাশপাশি হাঁটছিলাম। মল্লিকার চুলের মিষ্টি গন্ধ আমার নাকে আসছিল।

ছায়াটুকু পেরিয়ে মল্লিকা কাজলদের দিকে চলে গেল।

৪.

শীত কাটল। ঠিক মনে নেই সেটা কোন্ মাস ফাল্গুন না চৈত্র। না, চৈত্র নয়, হয়ত ফাল্গুনই। বেনারসের বোর্ডিংয়ের সেই অশ্বত্থগাছে আবার নতুন পাতা ধরতে শুরু করেছে—একদিন অফিস থেকে ফিরে ঘরের দরজা খুলতেই অবাক হয়ে দেখলাম, মেঝেতে একটা হালকা নীল রঙের খাম পড়ে আছে।

কুড়িয়ে নিয়ে ঠিকানাটার ওপর হাতের লেখা দেখে অবাক। এ-লেখা আমার অজানা। বাড়ির কেউ নয়, কলকাতার বন্ধুদেরও কেউ না। তবে কে? মুহূর্তের জন্যে আমার মল্লিকার কথা মনে এল। তবে কি মল্লিকা!

হ্যাঁ, মল্লিকার চিঠি। "কাজলের কাছ থেকে ঠিকানা আনিয়ে তবে তোমায় চিঠি লিখছি। কি ব্যাপার? কাশীতে ফিরে গিয়ে আমাদের একেবারে ভুলেই গেলে। আমি ত ভেবেছিলাম তুমি নিশ্চয়ই আমাদের একটা চিঠি দেবে। কোথায় চিঠি! মা প্রায়ই তোমার কথা বলে। কেমন আছ? খুব চাকরি করছ, না? বড়দিনের ছুটিতে কই এদিকে এলে না ত?..."

বিছানায় বসে বসে এই চিঠি—সরল নিতান্ত মামুলি কথায় ভরা এই চিঠি—বোধ হয় বার তিনেক পড়লাম। কি ভাল যে লাগছিল! মনে হচ্ছিল, মল্লিকা যেন আমার দিকে তাকিয়ে আছে, হ্যাঁ—আমার এই চিঠি-পড়া সে মনে মনে দেখছে। ঠোঁটের গোড়ায় একটু হাসি, চোখে বুঝি কৌতুক। যেন তার হাসি আর চোখ বলছে, কি কেমন অবাক করে দিয়েছি!

মল্লিকা আমায় চিঠি লিখবে—এমন আশা আমার ছিল না। ব্যাপারটাকে আমার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হত। কতদিন ভেবেছি আমি একটা চিঠি লিখি, মল্লিকা নিশ্চয় তার জবাব দেবে। লিখি-লিখি করেও লিখতে পারি নি। মনে হত, এই চিঠি লেখাটা হয়তো ভাল দেখাবে না, মল্লিকা কিছু ভাবতে পারে। চিঠি লেখার মতন ঘনিষ্ঠতা ত আমাদের হয় নি। কিংবা, হয়তো আমাদের ঘনিষ্ঠতা এত পলকা এমন ছেলেমানুষিতে ভরা যে, তার দাবিতে চিঠি লেখা চলে না।

বেনারসে ফিরে এসে মল্লিকার কথা আমি না ভেবেছি, এমন দিন ছিল না। অনেক ভেবে বিচার-বিবেচনা করে আমার মনে হয়েছিল, অত্যন্ত সহজ সরল জিনিসটাকে কাঁপিয়ে বড় করে

তোলার অর্থ হয় না। একদিন হল্লোড়ে পড়ে কে আমার মুখে বালি ছুঁড়েছে, দুটো কথা বলেছে, হেসেছে, ছুটোছুটি করেছে—এটা এমন কোনো মনে রাখার মতন কথা নয়। হয়তো মল্লিকা সে-কথা ভুলে গেছে। বা, আমরা যেমন সাদামাটা হাসিখুশী আনন্দের স্মৃতি সঞ্চয় করে রাখি তেমন করে সঞ্চয় করে রেখেছে।

মল্লিকার সঙ্গে আমার সম্পর্কের কোনো শক্ত বাঁধন আমি খুঁজে পেতাম না। বরং আমার ধারণা হয়েছিল, সরল স্নেহপ্রীতি সৌহার্দ্যের সম্পর্ক ছাড়া অন্য কোনো সম্পর্কের কথা এখানে আসে না। এই নির্মল পারিবারিক স্নেহ-মমতার সম্পর্কের সুতো ধরে আমি বেশি দূর যেতে পারি না, যাওয়া অনুচিত। এ-কথা মনে হলে, কখনও কখনও কেমন যেন গ্লানি অনুভব করতাম।

মল্লিকার চিঠি পেয়ে মনে হল, এ-চিঠির সঙ্গে কাজলের চিঠির তফাত বড় একটা নেই। সরল সহজ চিঠি। স্নেহপ্রীতির স্পর্শের মতন। ভাল লাগে। তার বেশি কিছু নয়।

চিঠির জবাব দিলাম। সুরের মিল রেখেই। তবু হয়ত কোথাও কোথাও একটু সুর কেটে গিয়ে থাকবে। ইচ্ছাকৃত কি না বলতে পারি না।

অনাত্মীয় কোনো মেয়েকে চিঠি লিখি নি জীবনে। মল্লিকার চিঠি—তা সে যেমন হোক—তার রোমাঞ্চ উত্তাপ কল্পনা আমায় কয়েকটা দিন মোহাচ্ছন্ন করে রাখল। চিঠি পৌঁছবার সময়টুকু হিসেব মতন বাদ দিয়ে, তারপর প্রতিটি মুহূর্ত আমি কল্পনা করেছি, মল্লিকা আমার চিঠি পড়ছে, পড়ছে আর হাসিমুখ তুলে হয়তো তার পড়ার টেবিলের জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ভাবছে একটু, আবার চিঠিতে চোখ নামাচ্ছে।

সপ্তাহ কাটল। অফিস থেকে ফিরে ঘরের দরজা খোলার আগে মনে মনে কল্পনা করতাম, ঘরের মেঝেতে আর-একটা

হালকা নীল খাম এসে পড়ে আছে। দরজা খুলে দেখতাম মেঝে পরিপাটি ফাঁকা। কিছু নেই। শূন্য। মন খারাপ হয়ে যেত।

অপেক্ষা—অপেক্ষা—অপেক্ষা। মল্লিকার চিঠি এল মাসখানেক পর।

"আমার জ্বর হয়েছিল। সবে ভুগে উঠলাম। তোমার চিঠি বলেই জবাব লিখছি। নয়তো লিখতাম না। তুমি চটে উঠবে সেই ভয়ে দু-চার কথা লিখে ফেলছি। তোমার ভীষণ রাগ। অত রাগ কিন্তু ভাল না···।"

মল্লিকার কি জ্বর হয়েছিল? জ্বর যদি না, তবে অন্য কোন অসুখ? খুব ভুগেছে? ক্লেশ কষ্ট পেয়েছে? চিঠিতে কিছু লেখা নেই। তবু চিঠিটা হাতে করে বসে থাকলাম অনেকক্ষণ।

বিকেলের আঁচল গুটোনো সারা হয়েছে ততক্ষণে। অশ্বত্থের মাথায় বুঝি শেষ রোদের আলগা গিঁট ফিতের ফুল। খোলা জানলা দিয়ে চোখে পড়ছিল একটি শাখা, পত্রপল্লবের জাফরিতে ফিকে আলোর রেশটুকু লেগে আছে তখনও। নীচে আটা-কলের সেই পরিচিত নিত্যকার শব্দ। দু একটি গলার স্বর ভেসে আসছিল আশপাশের ঘর থেকে।

মল্লিকার চিঠির কাগজের রঙটা হালকা নীল। দামী রাইটিং প্যাডের কাগজ। কালির রঙ গাঢ়। অল্প কয়েকটি কথা। এই স্বল্পতা আমায় হতাশ ক্ষুব্ধ করে তুলছিল। ও কেন লিখল না, ওর কি অসুখ করেছিল, কতখানি ভুগেছে, কতটা কষ্ট পেয়েছে? আমি যেন মল্লিকার ছোট চিঠির মধ্যে মল্লিকার অসুস্থ ক্লান্ত মুখখানি অনুভব করতে পারছিলাম। মনে হল, আজ এখন এই পড়ন্ত বিকেলে মল্লিকা তার ঘরে জানলার কাছে বসে আছে। শাড়ি জামা পালটায় নি। কাকিমা কোনো রকমে চুলটা বেঁধে দিয়ে গেছেন। বিছানায় বালিশে

চাদরে অরপালানো গন্ধ, আর পাউডারের গুঁড়ো। জানলার ওপর পাটের পরদা গুটোনো—মল্লিকা বাইরে ঢালু মাঠ আর বনতুলসীর জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে আছে। চোখের কোলে ক্লান্তি।

মল্লিকার সেই ফাঁকা নিরিবিলি নিস্তব্ধ ঘর আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছিলাম। ছবিটা অনুজ্জ্বল, যেন চারপাশে গাঢ় মেঘলা করে আছে, সেই মেঘলার মধ্যে শিস পেনসিলে আঁকা মল্লিকা। মনে হল সন্ধ্যের বাতি জ্বলেনি বলে ঘরটা অত ছায়া ছায়া।

আমার ঘরের বাইরে বারান্দায় সন্ধ্যে পা বাড়িয়ে দিল। গাছের পাতাগুলো এখন কাঁপছে একটু। বাতাস বইতে শুরু করল বুঝি। এ-বাতাস বেশিক্ষণ থাকে না। সন্ধ্যের ঝোঁকে দু এক দমকা আসে যায়—তারপর রাত্রে, অনেকটা রাত্রে ঠিকমতন বইতে শুরু করে।

কে যেন আসছিল, চিঠিটা বালিশের তলায় রেখে দিয়ে উঠে পড়লাম।

অমিয়দা। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই অমিয়দা বলল, 'কি ব্যাপার, ঘর অন্ধকার করে ভূতের মতন বসে আছ ?'

'এই এমনি।'

'এমনি…!…যাও যাও বাইরে যাও, বেড়িয়ে টেড়িয়ে এস একটু। হেলথের জন্যেও একটু নড়াচড়া করতে হয় হে কবি।' অমিয়দা ঘরের ভেতর সুইচ বোর্ডটার সামনে দাঁড়িয়ে আলো জ্বেলে দিল। 'দাও একটা সিগারেট দাও।'

'আপনি আমায় কবি বলেন কেন ?' পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে এগিয়ে দিলাম। আচমকা আলোটা চোখে লাগছিল।

অমিয়দা সিগারেট ধরাল। এক বুক ধোঁয়া পরিতৃপ্তির সঙ্গে

গিলে যেটুকু অবশিষ্ট থাকল ঘরের বাতাসে বিলিয়ে দিতে দিতে মৃদু হাসল। 'ইউ বিহেভ লাইক এ পোয়েট।'

'কী আশ্চর্য।' আমি সহাস্য মুখে অমিয়দার সরল চোখের দিকে চেয়ে বলি, 'আমার বিহেভিয়ারে কাব্য কোথায় পেলেন।'

অমিয়দা দু'এক পলক আমার চোখে চোখে তাকিয়ে যেন বোঝাতে চাইলেন, যা বললাম মেনে নাও, অযথা আমায় বকিয়ো না।

'তুমি কবিতা-টবিতা লেখ না ?' অমিয়দা আমার তক্তপোশের ওপর বসে পড়লেন।

না। আমি মাথা নাড়লাম।

'বাজে কথা।' গ্রাহ্য না করার মতন করে কথাটা বললেন অমিয়দা, সিগারেটে আরও একটা দীর্ঘ টান দিলেন, 'কবিতা না লিখলে কেউ এমন রোগা হয় না।'

অমিয়দার বলার ভঙ্গিতে আমি হেসে উঠলাম।

'হাসছ ?' অমিয়দা পায়ের উপর পা তুলে বসে হাত বাড়িয়ে বালিশটা টেনে কোলে তুলে নিলেন। মল্লিকার চিঠিটা আলগা পড়ে থাকল। আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না, চিঠিটা এই মুহূর্তে হাত বাড়িয়ে তুলে নেব কি নেব না। 'দেখ শ্যামল'—অমিয়দা আমায় বিজ্ঞের মতন উপদেশ দেবার ভঙ্গিতে বললেন, 'আমার এক জ্যাঠতুত ভাই আছে, রোগা, ভীষণ রোগা, সে কবিতা লেখে। আর আমার ঠিক পরের ছোট সহোদর ভাই যে, সেও ভীষণ রোগা তোমার মতনই। ভায়া অবশ্য কবিতা লেখে না, কিন্তু আরও স্ট্রেনাস কাজ করে, প্রেম করে। হয় কবিতা, না হয় প্রেম—তা না হলে কেউ রোগা হয় না, হতে পারে না। ইমপসব্‌ল্‌···।' অমিয়দা নিশ্চল কণ্ঠে রায় দিয়ে থেমে গেল।

মল্লিকার চিঠি বিছানার মাথার দিকে নিঃসাড়ে পড়ে আছে। আলোয় সাদা রঙের খামের ওপর গভীর নীলের লেখাগুলো যেন

দেখা যাচ্ছে, পড়াও যাচ্ছে। আমার বুকের মধ্যে হঠাৎ এক উষ্ণতা শিহরিত হল। বোকার মতন হাসলাম অমিয়দার দিকে তাকিয়ে। এবং আচমকা অন্যমনস্ক হয়ে পড়লাম।

একটু পরে বোধ হয় অমিয়দা বললে, 'যাও, গঙ্গার ধার টার থেকে খানিক ফ্রেস এয়ার খেয়ে এস।'

অমিয়দা চলে গেল। মল্লিকার চিঠিটা অযত্নে টেবিলের বইয়ের ভাঁজে রেখে দিলাম।

ঘর ছেড়ে বাইরে যেতে মন চাইছিল না। ঘরের মধ্যেও কিছুক্ষণ আগের সেই প্রাক সন্ধ্যার আচ্ছন্নতা ছিল না। অমিয়দার রঙ্গ-রসিকতা আমার মনের ধূসরতা এবং ইচ্ছাকে যেন অপরিচ্ছন্ন ভাবে ধুয়ে দিয়েছে। মল্লিকার রোগশয্যার ছবিটি তেমন করে আর চোখে পড়ছিল না।

গ্রীষ্ম কাটল। বর্ষায় মল্লিকার আর এক চিঠি এল। আগের চিঠির মত ছোট নয়, বড়। অনেক কথা লিখেছে মল্লিকা। তার অসুখ সেরে গেছে, মাঝে কলকাতায় গিয়েছিল, কাজলের চিঠি বড় একটা পায় না, ওখানে খুব বৃষ্টি নেমেছে, সারাদিন বসে বসে বৃষ্টি দেখছি। আকাশটা কী সাজে সেজে আসে, তোমায় দেখাতে পারছি না। আমার কাকাতুয়াটা বৃষ্টি নামলে খাঁচার মধ্যে বসে বসে আমায় খুব ডাকে।……কাল নোখ কাটতে গিয়ে ডান হাতের কড়ে আঙুলটা কেটে গেছে, খুব ব্যথা, আর বেশি লিখতে পারছি না। তুমিই বা কত বড় চিঠি লেখ! তাড়াতাড়ি জবাব দিও, নয়ত আমিও আর লিখব না।

জবাব বুঝি সেদিন রাত্রেই লিখতে বসেছিলাম। কত যত্নে কত ভেবে ভেবে জবাব লিখেছি। পরের দিন নতুন করে সেই চিঠির আবার নকল করেছি। দুপুরে অফিস থেকে এক ফাঁকে পোস্ট-অফিসে গিয়ে টিকিট কিনেছি। কিন্তু কী ভেবে চিঠিটা

আর সেদিন ফেলা হয় নি। মনে হয়েছে, এত তাড়াতাড়ি—চিঠি পেতে না পেতেই এই জবাবটা কি ভাল দেখাবে! মল্লিকা কি সত্যই এত তাড়াতাড়ি জবাব চেয়েছে! কই, আমার চিঠির জবাব ত সে দু চার সপ্তাহের মধ্যেও দেয় না।

ওটা কথার কথা—ওই তাড়াতাড়ি জবাব দিও কথাটা কথার কথা। নিজের মনে নিজেকেই আমি শাসন করেছি, সংশয় তুলেছি। হয়ত ঠিক এই পত্রপাঠ জবাব মল্লিকা চায় না। বাড়িতে কাকিমা আছেন কাকাবাবু আছেন। গুরুজনদের চোখ এড়িয়ে চিঠিটা মল্লিকার হাতে পৌঁছানোর কথা নয়। হয়ত মল্লিকা কাকাবাবুর হাত থেকে চিঠিটা নিতে লজ্জা পাবে। কাকিমা যখন শুধোবেন, কার চিঠি রে মল্লি—তখন কি আর মল্লিকা একটু আড়ষ্ট বোধ করবে না! অস্বস্তি লাগবে তার। 'শ্যামলদার চিঠি' বিড়বিড় করে বলবে মল্লিকা, চোখ তুলে চাইবে না মার দিকে, নিজের ঘরে চলে যাবে।

দ্বিধা সংশয় সঙ্কোচে চিঠিটা আর ডাকবাক্সে ফেলতে পারলাম না। উদার আহ্বানে মুখ হাঁ করে লাল গোল বাক্সটা দাঁড়িয়ে থাকল, যেন টালি-বারান্দার ছায়ায় দাঁড়িয়ে সকৌতুকে আমার এই অনিশ্চয়তা ভীরুতা দেখছিল।

টালি-বারান্দার তলায় স্থলপদ্মর ঝোপ, ধুলো-লাল পাতায় হাওয়া লেগেছে। দুপুরটা মেঘলা হয়ে আসছিল। রাস্তা দিয়ে একটা টাঙা চলেছে। ঘোড়ার গলায় বাঁধা ঘণ্টা, চাকার আওয়াজ, খুরের খটখটের শব্দে পোস্ট-অফিসের ভেতরের মৃদু গুঞ্জন, টেলির টরেটক্কা সব মিলেমিশে কিছুক্ষণ আমায় কেমন বেহুঁশ করে রাখল। পথে নেমে দেখি ধুলো উড়ছে, না রোদ না ঘন মেঘলা, চাপা গরমটা আরও গুমোট হয়ে গেছে। আকাশের এক প্রান্তে এক খণ্ড কালো মেঘের মুখ। বৃষ্টি কি আসবে?

আনমনে পথ হাঁটার সময় বুক পকেটের খামে মোড়া চিঠির লেখাগুলো টুকরো টুকরো ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন এলোমেলো ভাবে মনে আসছিল। চিঠি ফেলতে আসার সময় যে ব্যস্ততা মৃদু উত্তেজনা ছিল, এখন ফেরার পথে, অত কষ্টের চিঠি পকেটে বয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে যেতে তার কিছু আর অবশিষ্ট রইল না। হতাশ বিষণ্ণ ক্ষুব্ধ লাগছিল। মনে মনে বোধ হয় মল্লিকাকে বলেছি, কী আগ্রহে আনন্দে কষ্টে অধৈর্য হয়ে তোমার চিঠির জবাব লিখেছিলাম, তুমি তা জানতেও পারবে না।

অফিসের সামনে এসে পড়েছি কখন। গেটের বাইরে পানের দোকানটায় দু একজন কেরানীবাবু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পান চিবুচ্ছে, আর বিড়ি ফুঁকছে। নিত্যকার মতন ছাতুর দোকানটায় ছাতুঅলা বুড়ো বসে, তার নাতনী এক কুলো ছোলা বাছছে, সামনে কাঠির খাঁচা, পোষা তিতিরটা দানা খুঁটছে ইত্তি উত্তি। আকাশটা ততক্ষণে কালো হয়ে এসেছে।

বিকেলে বৃষ্টি নামল। সন্ধ্যের আলো জ্বলল বিকেল বিকেল, আদিগন্ত গ্রাস করে বর্ষা নেমেছে। হোটেলের ঘরে বসে বাতি জ্বেলে বসে বসে সেই বৃষ্টিতে, ভিজে বাতাসের আলুথালু স্পর্শে মন ডুবিয়ে নতুন করে চিঠি [illegible]ল্লিকাকে। "আজ অফিসে শেষ বেলায় বৃষ্টি নেমেছে, [illegible]। সন্ধ্যে বেলায় আমার ঘরে একলা বসে বসে তোমায় চিঠি লিখছি। জানলা দিয়ে দেখছি অশত্থ গাছটা ভিজে একশা, বাতাসের দাপটে কাঁপছে, বারান্দাটা জলে জল, আমাব দরজার কাছটায় পুকুর হয়ে গেল, বৃষ্টি পড়েই চলেছে, সারা রাতেও বুঝি থামবে না। সব কেমন চুপচাপ। সাত নম্বর ঘরে অনিল বোস সেতার বাজাচ্ছে। মল্লিকা, এক একটা দিন—এই রকম দিন এমন ভাবে আসে যে কিছু আর ভাল লাগে না, কী যে মনে হয়, কে জানে। তোমায় চিঠি লিখতে

বসেছি বলে আমি বেঁচে গেছি। তুমি না থাকলে কি যে করতাম কে জানে····· ।"

অনেকটা লিখে মনে হল, এমন করে আমি মল্লিকাকে চিঠি লিখতে পারি না। হোক না কথাগুলো সাদামাটা সরল নিষ্কলুষ, তবু এর মধ্যে যে গভীর অন্তরঙ্গ সুর, সেই সুরে একটি অনাত্মীয় মেয়েকে চিঠি লেখা যায় না। মল্লিকার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতার সীমা একটি জায়গায় পৌঁছে তারপর ঝাপসা হয়ে গেছে. সেই সীমা সম্পর্কে আমি সচেতন, হয়ত মল্লিকাও। আমরা প্রীতি এবং পারিবারিক সম্পর্কের ততটুকু সুযোগ নিতে পারি, যতটুকু সুযোগ সকলের চোখে স্বাভাবিক মনে হবে। তার বেশি নয়।

মল্লিকার লেখা চিঠির সঙ্গে আমার চিঠির সুরের তুলনা করে মনে হল, প্রীতি এবং এক বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছাড়া তার চিঠিতে অন্য কিছুর স্বাদ খুঁজে পাওয়া যায় না। আমার চিঠি আরও বুঝি নিবিড় নিকট হবার প্রত্যাশায় লোভীর মতন সুযোগ খুঁজছে। মল্লিকা হয়ত আমার মনের এই লুব্ধতা বুঝতে পারবে। হয়ত সে অসন্তুষ্ট হবে, বিরক্ত হবে। আমার সম্পর্কে ধারণা পালটে যাবে। শ্রদ্ধা এবং প্রীতি নষ্ট হবে। বন্ধুত্বের সৌন্দর্যটুকু মলিন হয়ে উঠবে। 'তোমাদের এ-সব দেখলে ঘেন্না হয়—' মনে মনে বিরক্ত হয়ে হয়ত বলবে মল্লিকা, মেয়েদের সঙ্গে একটু ভাবসাব হলে কি একেবারে যা খুশি তাই ভেবে নিলে ! তোমাকে এরকম ভাবি নি। তুমিও ঘেন্না ধরালে। আর নয়, চিঠিপত্র আর নয়··· ।'

কোনো কোনো বিষয়ে মানুষের অদ্ভুত মোহ থাকে। আত্ম-সম্মানে আমার মোহ ছিল তীব্র। মর্যাদা নষ্ট হবে এমন কিছু করতে আমার ভয় ছিল ভীষণ। মল্লিকা আমায় নিতান্ত সাধারণ, সেই একই স্রোতের খড়কুটো ভেবে নিক এ-চিন্তার অগৌরব এবং লজ্জা যেন ধিকার দিচ্ছিল আমায়।

মুখরিত আচ্ছন্ন বর্ষার মোহে বাইরের দিগন্তহীন অন্ধকারের অদ্ভুত প্ররোচনায়, এই নির্জন নিঃসঙ্গ ঘরের নিভৃতে বসে সেদিন কত কথাই লিখেছিলাম। যখন খেয়াল হল, এ-চিঠি পাঠানো যাবে না, তখন লেখা-পাতা ক'টি আস্তে করে কাগজের তলায় রেখে দিলাম।

বৃষ্টি পড়ে চলেছে। অল্প জোরের বাতিটা মাথার ওপর দেওয়ালে জ্বলছে। দরজার ফাঁক দিয়ে জল এসে আধখানা ঘর ভেসে গেছে। সেই জলের দিকে চেয়ে চেয়ে মনে হল, কোনো কোনো দিন এমনি করে বৃষ্টি নামে যে-বৃষ্টি বড় উদ্দাম উতলা, পলকা দরজার আড়াল তুলে তার জল রোধ করা যায় না। এই ছোট ঘরের আধখানা সে অনায়াসে ভাসিয়ে নেয়।

পরের দিন সকালে নতুন করে মল্লিকাকে চিঠি লিখেছিলাম।

৫.

ছেলেবেলায় দেখতাম আমাদের রেল কোয়ার্টারের শেষ সীমানায় ডোমপাড়ার মাঠে শীতের গোড়ায় ইরানীর দল এসে বাসা বাঁধত। ছোটখাটো ছেঁড়াফাটা তাঁবু, পোঁটলা পুঁটলি, ইটপাতা উনুন, গাছের ডালে ঝুলনো দোলনা, মাথায় ফেট্টি বাঁধা মেয়ে, লম্বা পেটা চেহারার পুরুষ, বাচ্চা কাচ্চা, চেঁচামেচি, দুর্গন্ধ—সমস্ত মাঠটার চেহারাই বদলে যেত। দিনের পর দিন কাটত কিছুতেই আর নড়তে চাইত না ওরা। রেলপাড়া অতিষ্ঠ হয়ে উঠত। শেষ পর্যন্ত থানা পুলিসের ধমক খেয়ে খেয়ে একদিন রাতারাতি ইরানীগুলো পাততাড়ি গুটিয়ে কোথায় চলে যেত কে জানে; ডোমপাড়ার মাঠটা কিছু আবর্জনা, পোড়া পোড়া বিক্ষিপ্ত ইট, যাযাবর সংসারের ইতস্তত কিছু স্মৃতি নিয়ে আবার ফাঁকা হয়ে যেত। তবু কিছুদিন সেই মাঠ যেন তার সাবেক চেহারা ফিরে পেত না, ইরানীরা চলে গেলেও তাদের

ছায়া বুঝি মাঠের বুকে পড়ে থাকত। অবশেষে একদিন আমরা ইরানীদের কথা ভুলে যেতাম, ডোমপাড়ার মাঠও ভুলে যেত।

সেবারে কাশীতে যে-বর্ষা নেমেছিল তার চেহারাও অনেকটা ওই ইরানীদের মাঠ দখলের মতন। একদিন এল, পোঁটলা পুঁটলি খুলে ছড়িয়ে বিছিয়ে সংসার ফাঁদল, তারপর আর যাবার জন্যে পা তোলে না, গা-ও করে না। মেঘ আর মেঘ, বাদলা মেঘলা সর্বক্ষণ প্রায়, বৃষ্টির মুখে লাগাম নেই, ছুটো দিনও বুঝি একটানা আকাশে রোদ থাকে না। স্যাঁতসেঁতে কাশী শহরটা ভিজে ভিজে রোদ না পেয়ে ঠাণ্ডা, নিষ্প্রভ, অসুস্থ মলিন হয়ে উঠেছিল। মনে হত বাসি ভেজা কাপড়ের মতন এই শহরটা আমাদের গায়ে লেপটে আছে। আশ্বিনের চৌকাট ডিঙিয়ে অনেকটা পথ চলে এল সেই বিবর্ণ অসহ্য বর্ষা, তবু শরতের রোদ ফুটল না, আকাশ নীল নয়, ভাসা ভাসা হালকা সাদা মেঘ নেই কোথাও, শ্যামলতা নিষ্প্রভ। ক্যালেণ্ডারের চৌকো ঘরে পুজো ততদিন নাগালের মধ্যে এসে পড়েছে। তবু এই বাদলা আর মেঘলা কাটিয়ে ছুটির হাসিখুশী নিটোল মুখ দেখা যাচ্ছিল না।

আমরা যখন তিক্ত বিরক্ত, হতাশ, নিত্য অভিসম্পাত করছি এই কদর্য বর্ষাকে তখন কবে যেন একদিন সকালে উজ্জ্বল স্বচ্ছ রোদ এসে বারান্দা ভাসিয়ে দিল, অশ্বত্থ গাছের পাতা চকচক করে উঠল, আকাশ ভরা টলটলে আলো, কী নির্মল, যেন ধোয়া মোছা শেষ করে দিগন্ত আজ পরিচ্ছন্ন হয়ে দেখা দিয়েছে, রোদে পায়রা উড়ছে, চিল ডানা মেলেছে, বিরাট আকাশের প্রান্তে শুভ্র তুলোট মেঘ আলপনার মতন ছড়িয়ে আছে।

বোর্ডিংয়ের ঘরে ঘরে সেদিন এই শারদ প্রভাতের অভ্যর্থনা হয়ে গেল। সরবে সোচ্ছাসে। সুধাংশু তার এস্রাজ একতারার মতন বাজিয়ে বাজিয়ে গান গাইল, আগমনী গান, প্রায় সারাটা

বোর্ডিং সমস্বরে সে-গানে গলা মেলাল। শৈলদা বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তারস্বরে তার একটি মাত্র মুখস্থ কবিতা আওড়াতে লাগল : আজি কি তোমার মধুর মুরতি হেরিনু শারদ প্রভাতে · ।

অফিসে ছুটির হুল্লোড়টা যেন আরও স্পষ্ট প্রকট হয়ে উঠল। ছুটি ছুটি ছুটি।···আমাদের সেকশানে ছুটি নিয়ে কেমন একটা ষড়যন্ত্র চলছিল। জনা কয়েক হয়ত পেতে পারে কিন্তু সবার নয়। টানা পনের দিন ছুটি দিতে ওপর মহল এবার রাজী নয়। গতবারের মতন আগু পিছু দু দলে ভাগ করে নেব—তাতেও গররাজী সাহেবরা। বলে, পুজোর তিন দিন ছুটি থাক—বাকি দিনে অফিস হোক।

আমাদের সেকশানটার সবাই ছোকরা, এক বড় বাবু আর অতুলবাবু ছাড়া। সবাই ছুটির জন্যে পা তুলে আছে। বাড়ি যাবে। পুজোর সময় কোন্ বাঙালী প্রবাসে থাকতে চায়! অথচ, এই শেষ সময় মন্থরার মুখে সাংঘাতিক দুঃসংবাদ শোনাব মতন এ কি শুনছে সবাই, মাত্র তিন দিন ছুটি।

অপ্রত্যাশিত এই দুঃসংবাদে আমার মন হতাশ, ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। মল্লিকার শেষ চিঠি পেয়েছি অল্প ক'দিন আগে। লিখেছে : ষষ্ঠীর দিন দুপুরে আমরা যাচ্ছি। তুমি সপ্তমীর দিন বাড়ি আসছ ত? এবারে না হয় আরও ক'টা দিন বেশী ছুটি নিয়ো।

কী আকুলতা প্রত্যাশা স্বপ্ন নিয়ে এই পুজোর ক'টা দিনের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম এ-কথা কাউকে বোঝাবার নয়। মল্লিকার সঙ্গে দেখা হবে আবার—এই চিন্তা আমাকে সর্বক্ষণ রোমাঞ্চিত করে রাখত। কত কিছু কল্পনা করেছি, প্রথম সাক্ষাৎটি কেমন করে হবে, মল্লিকা হয়ত হাসবে, চোখ তুলে বলবে—না এলে মজা দেখাতাম তোমায়; আমি নীরবে হাসব, হয়ত বলব, তুমি না এলে আসতাম না।

কেন ?

ভাল লাগে না।

মল্লিকা দু মুহূর্ত চোখে চোখে তাকিয়ে মুখ নামিয়ে নেবে। হয়ত আর কিছু বলবে না। কিংবা মৃদু তিরস্কারের সুরে বলবে, ইস বড্ড যে !

এ-কল্পনার কোথাও কাঁটা ছিল না। সবুজ তৃণের মতন মসৃণ কোমল প্রান্তরে ঘাস ফুলের চুমকির মত আমার কল্পনা যেন অসংখ্য মধুর মুহূর্ত সৃষ্টি করে একটি অপরূপ ছবি এঁকে রেখেছিল।

তৃষ্ণার্তের মতন আমি যে সরোবরের আশায় এক একটি দিনকে বৎসর মনে করে যোজন অতিক্রম করছিলাম হঠাৎ মনে হল সেই সরোবর আমার কাছে নিষিদ্ধ হয়ে গেছে।

রাগে ক্ষোভে দুঃখে চোখে জল আসত। অফিসটা আরও অসহ্য হয়ে উঠত। ঘৃণা হত। মনে হত, এই পঞ্চাশ টাকার কেরানীগিরি আমার সব স্বাধীনতা সুখ শান্তি চুরি করে নিয়েছে।

মহালয়া এসে গেল। বোর্ডিংয়ের কয়েকজন চলে গেল বাড়ি। অন্যদের মধ্যে তখন যাই যাই ভাব। আমার ঘরে আমি একা অসুস্থ অসহায় রুগীর মতন শুয়ে থাকতাম। বারান্দায় রোদ লুটোপুটি খাচ্ছে, মাঝে মাঝে সমস্ত মন উদাস করে কেমন এক এক ঝলক বাতাস বয়ে যেত, ঘরে বুঝি ভ্রমর ঢুকে পড়ত এক একদিন, কিসের এক অদ্ভুত গুঞ্জন ভাসত এই শান্ত স্তব্ধ বোর্ডিংটায়।

আমরা তখনও দোনামোনায় আছি। মনে হচ্ছে, শেষ পর্যন্ত গতবারের মতন অষ্টমীর দিন থেকে সাতটা দিন সেকেণ্ড ব্যাচে ছুটি পাওয়া যাবে। কারণ অবাঙ্গালীদের অনেককেই ফার্স্ট ব্যাচে ছুটি দেওয়া হয়েছে। আমি মনে মনে ঠিক করে

ফেলেছিলাম, সপ্তমীর দিন পালাব। মথুরাপ্রসাদ অ্যাটেনডেন্স খাতায় আমার সইটা নকল করে দেবে। পরের তিন দিন ত আছেই ছুটি। তেমন তেমন হলে আরও দু চার দিন কামাই করব। একটা সিক রিপোর্ট নিয়ে ফিরব। কি আর হবে। গোটা ছুটিটাই উইদাউট পে করে দেবে। দিক।

ছুটির মধ্যে অফিসটা নেহাত বুড়ি ছোঁয়া। যাওয়া আসার ধরা-বাঁধা নেই। অর্ধেকেরও বেশি লোক ছুটিতে। অফিস প্রায় ফাঁকা। আমাদের সেকসানে বড়বাবু নেই। অতুলবাবুও না। ষষ্ঠীর দিন অ্যাকাউন্টেন্টের নোটিস পাওয়া গেল, আমাদের অষ্টমী থেকে সাত দিন ছুটি।

ছুটির নোটিসটা যেন আমাদের ক্ষোভ দুঃখ রাগ এক মুহূর্তে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দিল। তারপর আর মন বসতে চাইছিল না। কাশী ছেড়ে উধাও হয়ে গেল।

সপ্তমীর দিনের নাম সইটা মথুরাপ্রসাদের ঘাড়ে চাপিয়ে সেই দিনই পালালাম। রাতের গাড়িতে। ভোরের ট্রেন দেখতে কে জানে হয়ত মল্লিকা জানলা খুলে পথের দিকে চেয়ে থাকবে।

একটা বছর কেটে গিয়ে আবার সেই শরৎস্নিগ্ধ আকাশের তলায় দেখা হল। এবারের দেখায় কেমন যেন বেশী সুখ এসে আমাদের ভরে ফেলেছিল। কিছুটা সঙ্কোচও।

'ইস্, তুমি যে দিন দিন রোগাই হয়ে যাচ্ছ।' মল্লিকা প্রথম দেখাতেই বলল।

'নিজে কি মোটা হচ্ছ?'

'আমার কথা বাদ দাও।...তারপর কেমন আছ?'

'ভাল না। বেনারস আমার ভাল লাগে না।'

'খুব সুন্দর যায়গা শুনি!'

'গিয়ে থাকো না ক'দিন।' হঠাৎ কথাটা মনে পড়ে যায়, সকৌতুকে বলি, 'ওখানে তোমার ভাল লাগবে খুব—শিবেদের একেবারে সেরা যিনি তিনি আছেন ওখানে—স্বয়ং বিশ্বেশ্বর।'

'খুব যে ঠাট্টা হচ্ছে···' মল্লিকা লজ্জা পেল।

'ঠাট্টা কেন, যা সত্যি তাই বলছি।'

'থাক, আর তোমায় বলতে হবে না।'

আরেক দিন কি কথায় মল্লিকা বলল, 'তুমি কাশীর ওপর অত চটা কেন?'

'ফোর্থ রেট জায়গা, তাই।'

'কত লোক রয়েছে।'

'নরক বাস করছে।'

'যা মুখে আসে বলছ যে।' মল্লিকা বোধ হয় একটু ক্ষুণ্ণ হল। সামান্য চুপ করে থেকে আবার বলল, 'আসলে তোমার ভাল লাগে না অন্য কারণে।'

'কি কারণ?'

'বা, আমি কি করে জানব।'

মল্লিকার মুখে কোনো রহস্য ছিল না। তবু ওর দিকে অল্পক্ষণ অপলকে চেয়ে থাকলাম। চোখ ফিরিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে থাকলাম খানিক, পরে বললাম, 'আমি শীঘ্রি কাশী ছেড়ে পালাব।'

'না কি!'

'বলছি, তোমায়। আমার আর এক বিন্দু ভাল লাগে না। জীবনটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।'

'জীবন—' মল্লিকা চোখের পাতা তুলে অবাক চোখে চেয়ে থাকল।

মল্লিকার এই নিরীহ বিস্মিত দৃষ্টি আমার ভাল লাগছিল না। যে-তিক্ততা বিরক্তি হীনমন্যতায় আমি ভুগতাম—যা আমায়

জ্বালাত, উগ্র উত্তপ্ত করে তুলত—সেই জ্বালা তিক্ততা উত্তেজনা অনুভব করছিলাম। তিক্ত স্বরেই বললাম, 'আছ আনন্দে, এ-সব কথা বুঝবে না।···সেই একটা দেড়হাতের ঘর, বেলা দশটা বাজতে হুমুঠো ভাত মুখে গুঁজে কেরানীগিরি করতে যাওয়া। অফিসে যত রকমের ইতর নোঙরা কাণ্ড, রেশন তোলার গল্প, কে ক' পয়সার মাছ কিনে আজ ভাত খেয়েছে, কার প্রমোশন হল, মুখুয্যে সাহেবের হাতে-পায়ে কে তেল মাখাচ্ছে···এই ত চলছে সর্বক্ষণ, তারপর আবার বোর্ডিংয়ে ফের, চা খাও, হাত-পা তুলে ঘুমোও, না হয় তাস খেল। কদর্য!'

মল্লিকা চুপ। মনে হয়, এ-যেন তার শোনা-জানা কথা। শুধু চোখে সামান্য বুঝি সহানুভূতি ফুটেছে।

'নিজেকে এত ছোট মনে হয়।' দীর্ঘ নিশ্বাস পড়ল আমার, আক্ষেপের মতন শোনাল কথাটা। 'কোনোদিন ভাবি নি, এই চল্লিশ টাকার রেল-কেরানীগিরি করে জীবন কাটবে!···নিজের ওপরই ঘেন্না হয় এখন।'

সামান্যক্ষণ নীরবে কাটল। তারপর মল্লিকাই কথা বলল, 'দোষ ত তোমার।'

'আমার?'

'তোমাদের বাড়িতে তোমার জন্যে কেউ কম করেন নি।'

কথাটা অত্যন্ত রূঢ় শোনাল। এ-কথা মামুলি। আর পাঁচজনের মতন মল্লিকাও আমায় বোঝাতে চাইছে সুযোগের অসদ্ব্যবহার করার ফল এই—অগৌরব, ক্লেশ, হীনতা, কষ্ট। আমি চুপ করে থাকলাম।

'রাগ করলে।' খানিক পরে মল্লিকা বলল।

'না।'

'তবে অত গুম হয়ে রয়েছ?'

'এমনি। তোমার কথাটা ভাবছি।'

'থাক, আর ভাবতে হবে না। কেরানীগিরি করতে ভাল না লাগে—অন্য কিছু করো। যা ভাল লাগে।' মল্লিকা আমার হাতে একটু হাত রেখে উঠে পড়ল। 'মনের জোর থাকলে মানুষে কত কিছুই ত করে।'

আবার সেই কাশী। গোধূলিয়ার মোড়ে হলুদ রঙের বোর্ডিং, একুশ নম্বরের এক চিলতে ঘর। তখনও সূর্য ওঠে নি, শীত শীত বাতাস, ঘরের তালা খুলে পলকা দরজাটা হাট করে দিলাম। আট দিনের বাসি গা গুলোনো বাতাস, জমা ধুলো, সোঁদা শ্বাসরোধী গন্ধ নাকে এসে যেন দূর দূর করে তাড়িয়ে দিতে চাইল। দরজার গোড়ায় খান দুই চিঠি, দু একটি শুকনো অশ্বত্থ পাতা। বিছানাটা গোটানো, তক্তপোশের রুক্ষ পিঠটা নির্বিকার চেয়ে আছে, টেবিলটা অপরিষ্কার—আবর্জনার সামিল। দেওয়ালে জল চোঁয়ানোর দাগ, ক্যালেণ্ডারটা কাত হয়ে ঝুলছে।

সুটকেসটা কোনো রকমে নামিয়ে রেখে জানলাটা খুলে দিলাম। চিঠি দুটো মেঝে থেকে কুড়িয়ে সোজা বাইরে বারান্দায় এসে স্বস্তি।

উল্টো দিকের বাড়িতে ঘুম ভাঙা চোখে সেই বউ মেয়েটি এসে দাঁড়াল। দু এক পলক বুঝি তাকিয়ে থাকল এদিকে। প্রত্যাগতকে দেখল; তারপর চলে গেল। নীচের রাস্তা দিয়ে সাইকেল রিক্শা চলে যাচ্ছে। গঙ্গাস্নানের যাত্রী দু চার জন। আকাশের তলায় রোদ ফুটছে।

সকালের মৃদু শীতল বাতাসে অশ্বত্থের প্রশাখার পাতাগুলি কাঁপছিল, শব্দ ছিল না। নির্জীব ক্লান্ত হতাশ মূঢ়ের মতন দাঁড়িয়েছিলাম। গুঁড়ি বৃষ্টির মতন স্মৃতির চিক ঝুলছিল চোখের সামনে। অবশ বিষণ্ণ দৃষ্টিতে সেই ঘন নিঃশূন্য যবনিকার দিকে চেয়েছিলাম।

কে যেন বলেছিল, সুখ চার পয়সার মোমবাতি। জ্বলতে যেটুকু সময়, জ্বলল আর ফুরিয়ে গেল। আর এই দুঃখ, এই হতাশা, প্রত্যহের ঘাড় মুখ গোঁজা হামাগুড়ি—এর শেষ নেই। আমার আট দিনের সুখ আনন্দ তৃপ্তি কত ক্ষণস্থায়ী, এখন এই হেমন্তের সকালে ক্ষুব্ধ হয়ে ভাবছিলাম; অনুভব করছিলাম খুশীর শীর্ণ দুর্বল মোমবাতিটা নিবে গেছে, এবার ভরা অন্ধকারে থাকতে হবে। নিশ্বাস যেন দীর্ঘ—দীর্ঘ হতে হতে বুক ভারী ভার হল, চোখ ঝাপসা হয়ে এল। মল্লিকার ঈষৎ বিষণ্ণ শান্ত মুখটি যেন তখনও আমি দেখতে পাচ্ছিলাম। ওর শেষ কথাটি কানে নিশ্বাসের সুরে বাজছিল, 'আবার এক বছর—। তুমি ত আর আমাদের ওখানে যাবে না।'

চোখে জল এসে পড়েছিল। যন্ত্রণার আবেগে গলার শ্বাস-নালী টনটন করে উঠেছে।

কুড়ি নম্বর ঘরের দরজা খোলার শব্দ। যেন চোখের জল লুকোতে আমার একুশ নম্বরের খাঁচায় আমি ফিরে গেলাম।

যে জন্মান্ধ তার দুঃখ যত না, তার চেয়ে বুঝি বেশী যন্ত্রণা তার, যে আলো দেখেছে আগে অন্ধ হয়েছে পরে। মল্লিকার সঙ্গে আমার পরিচয় না হলেই ভাল ছিল। এই পরিচয় আমাকে আরও অস্থির পীড়িত অশান্ত করে তুলছিল। ভেবে দেখতাম, আগে—যখন মল্লিকার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না তখন এই কাশী শহর এই রেলের চাকরি এই পরিবেশ—গলা ডুবোনো এই পঙ্ককুণ্ড আমায় প্রত্যহ ক্ষুব্ধ বিষণ্ণ হতাশ করত। জীবন ক্ষুদ্র কৃশ মলিন হয়ে এসেছিল। নিশ্চেষ্ট নিরুদ্যম জড়ের মতন বর্তমান এবং ভবিষ্যতকে গ্রহণ করেছিলাম। মনে হয়েছিল, আমার ভাগ্য নির্ধারিত নির্বাচিত। এরপর আর নতুন কিছু নেই। …চিন্তাটা আমায় তুষের মতন পোড়াত, দুর্বল অক্ষম রুগীর

মতন যন্ত্রণা দিত। সংসারের কাঠগড়ায় আসামীর মতন দাঁড়িয়ে ছিলাম। মূঢ় নির্বাক হয়ে। প্রায় নিঃসন্দেহ হয়ে গিয়েছিলাম, আমার হাতের মধ্যে আমার অধিকারে আর কিছু নেই, কিছু না। এখন কেবল স্রোতে ভেসে যাওয়া, বাৎসরিক আড়াই টাকা মাইনে বৃদ্ধি, এবং এই মধ্যবিত্ত দারিদ্র্যহীনতা কদর্যতাকে ক্রমশ চক্রবৃদ্ধি হারে রক্তে গ্রহণ করা।

মল্লিকার সঙ্গে পরিচয়ের পর—প্রথম প্রথম নিজের দিকে আর তাকাই নি। প্রয়োজন হয় নি। পরিচয়টা যত স্থায়ী ঘনিষ্ঠ হতে লাগল ততই যেন নিজের দিকে তাকাবার তাগিদ দিচ্ছিল কেউ। পথ চলতি লোক আমায় কেমন দেখে কি ভাবে তার জন্যে মাথা ব্যথা কার! কিন্তু পথের লোক ক্রমে ক্রমে ঘরে আসা অতিথি হয়ে গেলে হঠাৎ বুঝি নিজের সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠতে হয়। এ-ঘরে যে আসছে বসছে তার চোখে না জানি ঘরটা কেমন লাগছে, কে জানে আমার সাজসজ্জা পোশাক আশাক ব্যবহার তার কেমন মনে হয়, কিবা ভাবে সে, কি—কি! একদিন স্বপ্ন দেখেছিলাম—কী একটা নাটক হবে, মল্লিকাকে আমি দিশেহারা হয়ে সাজাচ্ছি—তারপর নাটক শুরু হল যখন তখন মল্লিকা অবাক হয়ে বলল, 'ওমা আমাকেই ত সাজালে, তোমার সাজ কই?' সেই চরম শেষ মুহূর্তে মনে পড়ল, তাই ত এ-নাটকে আমাকেও মঞ্চে যেতে হবে—কিন্তু আমি একেবারে অপ্রস্তুত। তাড়াতাড়ি সাজঘরে ছুটে গিয়ে দেখি—সাজ সজ্জা রঙ তুলি কোথাও কিছু নেই, আয়নাটা চৌচির হয়ে মাটিতে পড়ে আছে। সাজঘর—স্বপ্নের সাজঘর তারপর অন্ধকার হয়ে গেল।

বোধ হয় প্রথম একটা বছর আমি বেহুঁশ হয়ে মল্লিকাকে শুধু সাজিয়েছি, ঠিক যেমনটি করলে তাকে মানাবে, সে আরও সুন্দর হয়ে উঠবে। তার সজ্জা শেষ হল না হয়ত, কিন্তু অনেকটা

হল। তারপর মনে হল, যে প্রীতির দৃষ্টি বন্ধুত্বের দৃষ্টি ওর ছুটি চোখে রোদের মত মুক্ত ছিল সেই ছুটি চোখে কেমন এক হালকা ছায়া দেখা দিয়েছে। সেই নির্দ্বিধার দৃষ্টি আর নেই, সারল্য কৌতুককর নয়, অনাগ্রহের দূরত্ব থাকছে না। হয়ত, হয়ত মল্লিকার অন্য এক আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে, হয়ত ভাল লাগার সম্পর্কের আকর্ষণ সে অনুভব করেছে।

তুমি ত এখনও তৈরি হলে না শ্যামল। স্বপ্নের মতনই কি তুমি শেষ সময় সাজঘরে ঢুকে সব কিছু ফাঁকা শূন্য দেখতে চাও?···না। কে চাইবে ভাগ্যের এই দুর্লভ অনুগ্রহ অনায়ত্ত থাক।

মল্লিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা না হলে আমি যেন সেই জন্মান্ধ থাকতাম, আলোর স্মৃতি মোহ আকর্ষণ আমায় নতুন করে পীড়া দিত না। কিন্তু এই পরিচয়, যোগাযোগ, অন্তরঙ্গতা যেন আলোর মতন উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল, আমি বিহ্বল আত্মহারা হয়ে সেই আলো চোখ ভরে দেখেছিলাম—আর এবার কাশীতে ফিরে এসে মনে হচ্ছিল, আমার ভাগ্য আমার সঙ্গে প্রবঞ্চনা করছে, আলো কেড়ে নিচ্ছে।

ক্ষোভ পীড়া হতাশা নির্জীবত্ব নিয়ে এতদিন যে জীবনের শরিক হয়ে যাচ্ছিলাম—এখন সে-জীবন আরও দুঃসহ হয়ে উঠল। নিজের অক্ষমতা অসামর্থ্যের জন্যে নিজেকে ধিক্কার দিতাম ; গ্লানির পীড়া আমায় প্রত্যহ পোড়াত ; মনে হত, এই ক্ষুদ্র অকিঞ্চিৎকর মলিন পরিবেশ থেকে মুক্ত না হলে আমার কোনো গৌরব নেই। রেলের চল্লিশটাকার তুচ্ছ কেরানীকে মল্লিকা ভালবাসবে, তার প্রত্যাশা এত দীন হবে, এ আমি কল্পনাও করতে পারতাম না।

না, ওই যে নাটক নভেলের গল্প, তেতলার চূড়োয় বসা মেয়ে ফুটপাথে নেমে এসে নিঃস্ব রিক্ত ছেলের হাত ধরে পথে বেরিয়ে যায়, গলায় মালা পরিয়ে দিয়ে বলে, 'তোমার সঙ্গে আমি গাছতলায়

গিয়ে দাঁড়াতে পারি—' এ-গল্পে আমার বিশ্বাস ছিল না। শ্রদ্ধাও নয়। সংসারে এতখানি বোকা কেউ নয়, কিংবা ঝোঁকের বশে যদি বা বোকামি করে ঝোঁক কেটে গেলে অনুশোচনায় মাথা খোঁড়ে।

মল্লিকার কাছে হাত পেতে ভিখারীর মতন আমি ভালবাসা চাইব না। এই অগৌরবে আমার মতি নেই। মল্লিকা দয়া পরবশে কিংবা ঝোঁকের মাথায় আমায় ভালবাসুক, অথবা নিতান্ত মোহবশে এ প্রার্থনাও কোনোদিন করব না।

তবে ?

তবে, সংসারে যা স্বাভাবিক সত্য, যা গৌরবের, যেখানে আমরা সমগোত্রীয় সেখানে দাঁড়িয়ে পরস্পরকে ভালবাসব। মল্লিকার ভালবাসা পেতে আমায় যোগ্য হতে হবে।

৭.

তখন প্রচণ্ড শীত। ডিসেম্বরের শেষ। বড়দিনের মাত্র কটা দিন ছুটি। মল্লিকার আকর্ষণ আমায় দিবারাত্র টানছিল। মনে হচ্ছিল, তার সঙ্গে যেন আমার কত কথা বলার আছে, তার সম্মতি অসম্মতির উপর যেন কত কী নির্ভর করছে। সমস্ত কথাই তখন আমার কাছে ভীষণ প্রয়োজনীয়, একান্ত জরুরী বলে মনে হচ্ছিল। যেন, এই সুযোগে কথাগুলি না বললে আর বলা হবে না, হবে না।

রাত্রের ট্রেনেই কাশী ছাড়লাম। পরের দিন বেলায় মল্লিকাদের সেই কোলিয়ারীতে।

অনেকদিন আর এ-দিকে আসি নি। আমাদের লাল বাংলোর চারিপাশে কত কি বদলে গেছে। নতুন বাংলো হচ্ছে, অনেকগুলো গাছ কেটে ফেলেছে, কোলিয়ারীর রাস্তাটা আরও চওড়া হয়েছে।

আমার বাড়িতে গুরুজনেরা অবাক। 'তুই !'

'ক দিন ছুটি আছে।'

'এক্সমাসের?'

'হ্যাঁ—।'

সামান্য চুপচাপ। কাকা শুধোলেন, 'তোর শরীরটা ত খুব খারাপ দেখছি। কাশীর ক্লাইমেট ভাল, সুট করছে না?'

'না। পেটের গণ্ডগোলে ভুগছি।'

'তোর আবার পেটের গণ্ডগোল, হাজার বার করে চা—আজে বাজে জিনিস খাবি, হবে না?' কাকিমা বলল।

অল্প চুপ করে থেকে কাকা বললেন, 'ভালই হয়েছে এসেছিস। ডাক্তারকে দিয়ে একবার ভাল করে চেক্-আপ করিয়ে নে। আবার খানিকটা চুপচাপ। সিগারেটের শেষ অংশটুকু অ্যাশট্রেতে ফেলে দিতে দিতে কাকা বললেন, 'কি বলে, রেলের সেই সব এক্সামিনেশন—অ্যাকাউন্টটেনসি—প্রিপেয়ার করছিস?'

আমি নীরব। নত চক্ষু।

কি বুঝলেন কাকা কে জানে। বললেন, 'মানুষের একটা অ্যামবিশন থাকে। তোর কিচ্ছু নেই। হোপলেস··' কাকা উঠে পড়লেন চেয়ার ছেড়ে।

কথাটা আমায় বাকি ছুপুরটুকু থেকে থেকে খোঁচাচ্ছিল। কোনো কোনো উচ্চাশা যে ফাঁসের মতন ঝোলে এবং গলায় লাগার পর দমবন্ধ হয়ে যায়—এ-কথা কাকার বোধ হয় জানা ছিল না। আমার ছিল।

শেষ বিকেলে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম। সেই পুরনো কোলিয়ারীর রাস্তা, ছু পাশে ঢালু ফাঁকা মাঠ, মাঝে মাঝে কুলী ধাবড়া। একটা মুদিখানা, পানের দোকান। এক চিলতে টিনের ঘরে সেলাই কল নিয়ে সেই বুড়ো এক চোখ কানা পাঞ্জাবী দর্জিটা এখনও বসে আছে।

পুরোনো স্মৃতি, এখন এই শীতের শেষ বেলায় হালকা অন্ধকারের মতন চোখে ভাসছিল।

মল্লিকাদের বাড়ির ঢালু পথটায় নামতে বুক কেমন কেঁপে উঠল। হঠাৎ উত্তেজনা বোধ করছিলাম। মল্লিকা চমকে যাবে, অবাক চোখে চেয়ে থাকবে, মুখে কথা জোগাবে না। 'তুমি।'

পা যেন একটু কাঁপছিল আমার, নিশ্বাস ঘন হয়ে আসছিল। মল্লিকাদের বাড়ির বাইরের চাতালটা চোখে পড়ছিল। এইমাত্র বাতি জ্বলে উঠল। জানলা খোলা, পরদা টানা। মল্লিকা কি আমায় দেখতে পেয়েছে?

মুখের সিগারেটটা ফেলে দিলাম। আর দশ পনের পা। চাতালের দিকে দরজাটা বন্ধ। ঘরে বাতি জ্বলছে। ঘন ধোঁয়া চাপ চাপ হয়ে কুয়াশার সঙ্গে মিশে মাঠে প্রান্তরে জমে আছে। বুনো তুলসীর গন্ধ।

আস্তে করে কড়া নাড়লাম। পা কাঁপছে, হাত কাঁপছে। বুক ধকধক করছিল।

সাড়া শব্দ নেই। সমস্ত বাড়িটা শান্ত নিঝুম। বাড়িতে যেন জনপ্রাণী নেই। আ, তবে আর বাতি জ্বালবে কে? আছে—নিশ্চয় লোক আছে।

আরও একটু জোরে কড়া নাড়তে—মল্লিকার গলা শোনা গেল, কাকে যেন কি বলল, তারপর ক'মুহূর্ত অপেক্ষার পর দরজা খুলে গেল।

বাচ্চা মতন একটা চাকর। অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়ে থাকল।

'মা কোথায়?' আমি এমন ভাবে বললাম কথাটা, ঘরের মধ্যে অসঙ্কোচে ত্বু পা এগিয়ে গেলাম যে বাচ্চাটা যেন অনায়াসে মনে করতে পারে আমি এ-বাড়ির অতি পরিচিত।

মাকে ডাকবে কি ডাকবে না, ঘর ছেড়ে যাবে, কি কোন প্রশ্ন

শুধোবে আমাকে ইত্যাদি ভাবতে ভাবতে বাচ্চাটা ক্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল। আমি ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে। ভেতরের ঘরের পর্দাটা আধ-গুটানো, ওদিক-পানে তাকিয়ে ডাকতে যাচ্ছিলাম—'কাকিমা'—কি ভেবে আর ডাকলাম না। গলার সাড়া দিয়ে মল্লিকাকে আগে ভাগে ধরা দিই কেন ?

'কি রে, মাকে ডাক।' বাচ্চাটা তখনও অনড় পায়ে দাঁড়িয়ে।

'মা নাই।' মাথা নাড়ল হাঁদাটা।

'নেই !. দিদিমণি—?'

'আছেন...' ঘাড় হেলিয়ে দিল ও।

'দিদিমণিকে ডাক—'

দিদিমণিকে ডাকতে হল না, গুটানো পরদার স্তূপ ঠেলে তিনি নিঃশব্দে যেন আবির্ভূত হলেন।

'ও-মা, তুমি—' না ও-ঘর না এ-ঘর, দরজার মাঝখানে বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল মল্লিকা। সাদা সিল্কের কেমন একটা শাড়ি তার পরনে। আঁচলটা পিঠের পাশ দিয়ে এসে গলায় জড়ানো। অগোছালো আড়ষ্ট বেশ !

কয়েক পলক ঘর নিস্তব্ধ থাকল, আমরা স্থাণুর মতন দাঁড়িয়ে থাকলাম, মল্লিকার নিষ্পলক চোখ আমার অপলক দৃষ্টি যেন আচ্ছন্ন অচেতন নিষ্ক্রিয় থাকল।

'এলাম।' ঈষৎ হাসলাম আমি, স্বাভাবিকতা ফিরে এল, 'কাকিমা কোথায় ?'

'মা টুলুকে নিয়ে কলকাতা গেছে।' মল্লিকা সচেতন স্বাভাবিক হল, 'দিদিমার খুব অসুখ।'

বাচ্চা চাকরটা এবার গুটি গুটি পায়ে চলে যাচ্ছিল। মল্লিকা বলল, 'বাইরের দরজাটা হাট করে রেখে যাচ্ছিস যে, বন্ধ করে দিয়ে আয়।'

'তুমি সব বন্ধ টন্ধ করে বসে থাক নাকি!' পরিহাসের গলায় বললাম।

'আহা, হাট করে বসে থাকব নাকি! কেউ নেই বাড়িতে।'

'কাকাবাবু?'

'বাবার ফিরতে সেই রাত ন'টা দশটা।'

'কী সর্বনাশ, বাড়িতে তাহলে তুমি আর তোমার ওই বাচ্চা—।'

'আমার বাচ্চা—!' মল্লিকা প্রথমে বিস্ময় পরে ভ্রূকুটি করে মুখ নীচু করল, 'অসভ্য...'

বাচ্চাটা চলে গেছে ততক্ষণে। ধমক খেয়ে মনে মনে জিব কেটেছি। বললাম, 'ওই ব্যাটাকে নিয়ে তুমি একলা আছ?'

মাথা নাড়ল মল্লিকা। 'তা হলেই মরেছিলাম। ওর মা আছে, ঠাকুর আছে।' মল্লিকা সরাসরি তাকাল, 'চল, ও ঘরে চল। ভেতরের বারান্দায়ও বসতে পার, তোমায় আমি দিশী ফায়ার প্লেসের আগুন করিয়ে দেব।'

'সেটা আবার কি?'

'আছে।' মল্লিকার মুখ ভরা হাসি, 'বাবার পাগলামি। এমন এক জিনিস তৈরী করিয়েছেন আমরা তার ধারে কাছে ঘেঁষি না, বাবা লোকজন এলে ও'টা সব সময় বাড়িয়ে দেন।'

মল্লিকা পিছু ফিরল, আমি ও-ঘরের দিকে পা বাড়িয়ে বললাম, 'খুব অভ্যর্থনা করছ তা হলে! ঝলসে মারবে।'

মধ্যের ঘরে একবার শুধু ঘাড় ঘুরিয়ে আমায় দেখল মল্লিকা, কিছু বলল না।

ভেতরের ঢাকা বারান্দাটা বেশ ঘরের মতনই। বারান্দার ধার ঘেঁষে পাতাবাহারের টব, গোলাপ গাছ, দুটি বুঝি অর্কিডও ঝুলছে, বাইরের উঠোনে কাকাবাবুর হরেক রকম গাছের টব ড্রাম কাঠের বাক্স। জবা গাছটা কলতলার কাছে তেমনিই আছে। উঠোনের

ডান দিকটায় টানা বারান্দা, ও পাশটায় রান্নাঘর। উঠোনের এক প্রান্তে লোহার একটা উনুন জ্বলছে। হরদম জ্বলে। ওটা বুঝি স্থায়ী চুল্লি।

কাকাবাবুর গদিঅলা চেয়ারটা পাতা আছে, কাঠের আরও একটা চেয়ার একপাশে, হালকা বেতের টেবিলটা পড়ে ছিল এক কোণে, তার ওপর একটা বই।

গদিঅলা চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসলাম। মল্লিকা বারান্দার সিঁড়ি বেয়ে উঠোনে নামল, রান্নাঘরে গেল, ফিরে এল একটু পরেই। বলল, 'একটু বসো, আমি পুজোর কাপড়টা ছেড়ে আসি।'

'আমি দেখেই বুঝেছিলাম তখন।' তরল হাসির গলায় বললাম।

'কি ?'

'পট্টবাস, গলবস্ত্র···এ একেবারে নির্ঘাত পুজারিনী মূর্তি।'

'বেশ, পুজারিনী মূর্তিই—' মল্লিকা সলজ্জ অথচ কৃত্রিম ভৎর্সনার ভাব করে তাকাল, 'পুজো শেষ করে উঠেছি,—কি এলে—আমি কি করব। এই ভাবে দাঁড়িয়ে থাকব নাকি !'

'পাগল, ঠাণ্ডায় নিমোনিয়া হয়ে যাবে। যাও শীগগির যাও—'

মল্লিকা মৃদু হেসে চলে গেল।

পা ছড়িয়ে আরাম করে বসে একটা সিগারেট ধরালাম। না কাকীমা না কাকাবাবু, অতএব নিশ্চিন্ত মনে সিগারেট খাওয়া যাবে। ঢাকা বারান্দাটা ছোট, কিন্তু গুছোনো ; জাফরি আছে ও পাশটায়। সংসারের টুকিটাকি কতক জিনিসও। বাতিটা ডোমের জন্য তেমন ছড়িয়ে পড়ছে না, প্রান্ত অংশগুলি কেমন ছায়া ছায়া। উঠোনের আলো অনুজ্জ্বল। শীতের সন্ধ্যে যেন মাঠ ঘাট ডিঙিয়ে ওই উঠোন অবধি এসে গেছে। ধোঁয়া নাকি

কুয়াশার জন্যে আবছা আবছা দেখাচ্ছিল ওদিকটা বুঝতে পারছিলাম না।

আশ্চর্য রকম শান্ত নিরিবিলি লাগছিল। রান্নাঘরে ঠাকুর ঝি বাচ্চা অথবা বাচ্চার মা কাজকর্ম করছে। এখানে তার ক্ষীণ শব্দটুকুও ভেসে আসছে না, কদাচিত একটু গলা পাওয়া যাচ্ছে।

মল্লিকা সারাটা দিন এই চুপচাপ শান্ত নিরিবিলির মধ্যে বসে থাকে, এই গাছ লতা পাতার গন্ধের মধ্যে। কি করে থাকে? কি করে সারাটা দিন? সেলাই করে? বই পড়ে?

কাকাতুয়াটা কোথায়? এদিক ওদিক খুঁজলাম। কাকাতুয়াটা কোথাও নেই। অবশেষে বারান্দার কোণের দিকে আর পাঁচটা জমানো জিনিসের কাছে শূন্য খাঁচাটা চোখে পড়ল।

ঘড়িতে সাতটা বাজল। বাইরে বেশ অন্ধকার। আকাশের একাংশ চোখে পড়ছিল। কালি মাখানো। মেঠো শীত পড়ছে বেশ।

আচমকা মনে হল, ঈশ্বর আমায় অবিশ্বাস্য দুর্লভ এক সুযোগ করে দিয়েছেন। এত নির্জন একান্ত ঘনিষ্ঠ পরিবেশের মধ্যে মল্লিকাকে পাব এ আমি কল্পনাও করি নি। অপ্রত্যাশিত আকস্মিক ভাবেই যেন যোগাযোগটা ঘটে গেছে। যে দুঃসহ মনোপীড়া যন্ত্রণা গ্লানি এবং দ্বিধা ও সঙ্কোচের বোঝা আমায় ক্রমশ অস্থির আকুল করে তুলেছে, এখন এই নিরিবিলিতে শান্ত নিশ্চিন্ত নির্বিঘ্ন পরিবেশে আমি সে-বোঝা সম্পূর্ণভাবে মল্লিকার কাছে নামিয়ে দিতে পারি। মনে মনেই যেন নিজেকে সাহস দিলাম; বললাম, তুমি ত কাশী থেকে ছুটে এসেছ অনেক কাজের কথা বলতে না! মল্লিকার সম্মতি অসম্মতি জানতে। তবে—?

মল্লিকার পায়ের শব্দ, গলায় হ্রস্ব একটু শব্দ। চোখ তুলে

তাকালাম। খুব হালকা কমলা রঙের শাড়ি পরনে, গায়ে জড়ানো শাল, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মুখে স্মিত হাসি।

মল্লিকা বারান্দা দিয়ে নেমে উঠোনে চলে গেল। রান্নাঘরে। তার গলার স্বর শুনতে পাচ্ছিলাম। উঠোনের দিকে কলতলার কাছে জবা গাছটার তলায় যেন একটা জোনাকি জ্বলল, নিবল, আবার জ্বলে কোথায় উড়ে গেল। শীতের কনকনে ভাবটা ক্রমশ যেন চাপঘন হয়ে আসছিল বারান্দায়।

চা নিয়ে ফিরল মল্লিকা। চা, ওমলেট। বেতের টেবিলটা টেনে নিলাম। বাচ্চা চাকরটা জল দিয়ে গেল। নিজের জন্যেও আধ পেয়ালা চা নিয়ে এসে মল্লিকা সামনে দাঁড়াল।

'শীত করছে তোমার?' পেয়ালা ঠোঁটের গোড়ায় এনে শুধলো ও।

'খুব না।'

'আজ বেশ শীত। ক'দিন ধরেই জোর শীতটা পড়েছে···'

'ডিসেম্বরের আজ উনত্রিশ, শীত পড়বে না?'

মল্লিকা দাঁড়িয়ে, বসার জন্যে তাড়া নেই। ওমলেটের একটা টুকরো মুখে দিয়ে চায়ের পেয়ালা তুলে নিলাম, 'কাকিমা নেই, খুব সংসার করছ!'

'বলতে হবে না মশাই। বাবাকে জিজ্ঞেস করো কী রকম গুছিয়ে চালাচ্ছি—' মল্লিকা চোখের হাস্যকর ভঙ্গি করল।

'জিজ্ঞেস করতে হবে না, অনুধাবন করছি—'

'কি?'

'অনুধাবন। ···মানেটা জানো না?'

'না, সব মানে তুমিই জানো।' মল্লিকা কৃত্রিম রাগের মতন করে বলল, 'নিজের হাতে চা করলাম, ওমলেট তৈরি করে দিলাম—মা হলে দিত তোমায় ওমলেট করে, পাঁপর ভেজে খাইয়ে দিত।'

'ডেনজারাস মেয়ে তুমি! মাতৃনিন্দা—!' আমি সহাস্য বিস্ময়ে বললাম।

'মোটেই নিন্দে নয়। মা সন্ধ্যেবেলা পেঁয়াজ ছোঁয় না।'

ছু জনেই নীরব হয়ে গেলাম। চায়ের পেয়ালা অর্ধেক শেষ হয়ে গেছে আমার। শীতের দাপটে চায়ের তৃষ্ণা যেন আরও বাড়ছিল। 'তোমার চা কি শেষ নাকি?'

'নেবে আরও একটু?'

'পেলে বর্তে যাই।'

'ইস্ কী চা-খোর!' মল্লিকা ঠোঁট নাকের কৃত্রিম শিহরিত ভঙ্গি করল। হাত বাড়াল, 'দাও, তোমার কাপ দাও—'।

বাকি চাটুকু শেষ করে কাপটা ওর হাতে দিলাম। মল্লিকা চলে গেল। সিগারেট ধরালাম নিশ্চিন্তে।

এই নিভৃত শান্ত নিবিড় পরিবেশ আমায় উন্মনা করে তুলল। মন স্ববশে নেই। কল্পনার একখণ্ড স্বপ্ন যেন হালকা মেঘের মতন ভেসে এল। যদি এমন হত, এই ঘর এই বারান্দা আমার হত, যদি মল্লিকাও আমার হত, আর এই শীত এই পরিপূর্ণ স্তব্ধ সন্ধ্যা চিরকালের মতন আমাদের হত···

'এই নাও—' মল্লিকা নতুন করে চা নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল।

বুঝি ছু এক পলক ঠিক খেয়াল করতে পারি নি। সজ্ঞান হয়ে হাত বাড়ালাম।

'তোমার ওই রোগটা আর গেল না।'

'কি?'

'ঘাড় গুঁজে থাকা। ···বাব্বা, এমন করে বসে থাকো—'

'অভ্যেস।'

'তা ঠিক। কিন্তু দেখলে মনে হয় যেন কী না কী, আকাশ ভেঙে পড়েছে মাথায়।' মল্লিকা মৃছু হাসল।

আকাশ ভেঙ্গে পড়েছে···! তা পড়েছে। তুমি ঠিক বুঝবে না মল্লিকা, এই ঘাড় মুখ গুঁজে বসে থাকা কেন? আমার মাথায় কোন আকাশ ভেঙ্গে পড়েছে! মল্লিকার দিকে তাকাতে কেন যেন সাহস হচ্ছিল না, উঠোনের অন্ধকারে চেয়ে থাকলাম।

'ঘরে গিয়ে বসবে?' মল্লিকা মৃদু স্বরে শুধলো।

'এখানেই ত বেশ।'

'শীত করছে না তোমার?'

'তেমন নয়।'

'সেই ফায়ার প্লেসটা আনতে বলব?' মল্লিকা হাসল।

'দগ্ধ করবে··· ?' আমি ভীত পরিহাসের স্বরে হাসলাম।

'এই, আমার বাবাকে নিয়ে ঠাট্টা, নয়—'

'সর্বনাশ, কাকাবাবুকে নিয়ে কে ঠাট্টা করল! তুমি একটা যা তা।'

'আমার বয়ে গেছে তোমায় দগ্ধ করতে। ···কি যে কথা তোমার—' মল্লিকা অন্য দিকে তাকিয়ে থাকল।

কথাটা কানে বাজল। উদ্দেশ্যবিহীন নিতান্ত পরিহাসবশে যে কথা বলেছিলাম, সরল স্বাভাবিক মনে মল্লিকা যার জবাব দিল, সেই দগ্ধ শব্দটা এখন যেন দ্বিতীয় অর্থ প্রকাশ করছিল। পাতাবাহারের টবের দিকে অন্যমনস্ক ভাবে চেয়ে থাকলাম।

মল্লিকা গায়ের দু-পাট করা শাল আরও একটু ঘন করে জড়িয়ে নিল। একবার মনে হল, কথাটা আমি মুখ ফুটে যদি বলি, আমায় তুমি দগ্ধই করেছ মল্লিকা, তবে কি হয়! কি হয় তবে!

'ক'দিন ছুটি তোমার?' মল্লিকা নীরবতা ভেঙে শুধলো।

'চার দিন।' সামনের কাঠের চেয়ারটার দিকে তাকালাম। মল্লিকা অনাড়ষ্ট সহজ ভঙ্গিতে বসে আছে, বাঁ হাতের পিঠ চিবুকের তলায়, একটি আঙ্গুলের ডগা দিয়ে নীচের ঠোঁট খুঁটছে।

'হঠাৎ চলে এলে যে?' মল্লিকা চোখে চোখে চেয়ে থাকল।

'এলাম।' মল্লিকার চোখে চোখে তাকাতে পারছিলাম না। মনে হচ্ছিল, কেন এসেছি আমার চোখমুখে সব যেন স্পষ্ট লেখা আছে। নীচু মুখে চায়ের কাপ টেনে নিলাম।

'ছুটি কাটাতে?'

'না।'

'কাকা-কাকিমাকে দেখতে?'

'উঁহুঁ, একটা কাজ ছিল—'

'ও!'

আবার চুপ। মল্লিকা ঝুঁকে পায়ের দিকে শাড়ির প্রান্তটা আরও টেনে সমস্ত পা-টাই ঢাকা দেবার চেষ্টা করল। রান্নাঘরে ঠাকুর জোরে কি একটা কথা বলল যেন, স্পষ্ট কানে এল না। কলতলার দিকে আবার একটা জোনাকি এসেছে।

'না বাবা, বড্ড শীত করছে আমার—, চল ঘরে গিয়ে বসি।' মল্লিকা ঈষৎ অসহিষ্ণু গলায় বলল।

'চল, আমার আর আপত্তি কি!'

মল্লিকা উঠে দাঁড়াল। 'আমি ঠাকুরকে একটু দেখে আসি, তুমি চা শেষ করে নাও।'

অল্প পরেই ফিরে এল মল্লিকা। উঠে দাঁড়ালাম। ভিতরের ঘরে যেতে যেতে শুধোলাম, 'কাকিমা কত দিন হ'ল কলকাতায় গেছেন?'

'এই ত গত শনিবার।'

'ফিরবেন কবে?'

'অসুখের বাড়িতে গেছে, একটু ভাল না দেখে কি আসতে পারবে!'

এই ঘরটা মল্লিকার। একদিকে বড় করে বিছানা পাতা, কাকিমা আর টুলুর, অন্য দিকে জানলা ঘেঁষে মল্লিকার খাট।

পরিচ্ছন্ন বিছানা, মোটা সুজনি পাতা। পায়ের তলায় লেপ গুছোনো। কাকিমাদের বিছানায় লেপ ছিল না। ঘরের একদিকে আলমারি, আয়না লাগানো ড্রয়ার। সেলাইকলটা কোনাকুনি করে রাখা। আরও কিছু আসবাব। টুকিটাকি জিনিস। দেওয়ালে ছবি। মল্লিকার ছেলেবয়সের একটা ছবিও আছে। এই ঘর আমার অপরিচিত নয়। মল্লিকা থাকতে কখনও আসিনি, কিন্তু কাকিমার কাছে কত বার এসেছি।

'তুমি বিছানাতেই বসো—মার বিছানায়—' মল্লিকা ঠোঁটে রঙ্গ তুলে হাসল একটু, 'মা-র ত তুমি পেট্ ক্যাট্...'

ঠাট্টাটা নতুন নয়, পুরনো। দাগ লাগে না কোথাও। বসলাম বিছানায়, হাসলাম। 'এ মন্দ চালাকি নয়!'

'চালাকি ?'

'নিজের বিছানাটা পাছে ময়লা হয়, খুব উদার হয়ে কাকিমার বিছানাটা দেখিয়ে দিলে। যা হয় পরের ওপর দিয়ে হোক।'

একটুক্ষণ তাকিয়ে থাকল মল্লিকা, কি যেন দেখল, ভাবল। 'আহা, মার বিছানা যেন আমায় পাততেও হয় না, পরিষ্কার করতেও হয় না।' নিজের বিছানার দিকে এগিয়ে গেল মল্লিকা।

'হয়, তবে নিজেরটি যেমন গুছিয়ে করা হয়—পরেরটি কি আর তেমন...'

'আমি অমন স্বার্থপর নই।'

'নও ?'

'স্বার্থপর—!' সবিস্ময়ে চেয়ে থাকল মল্লিকা।

'আমি অন্তত স্বার্থপর বলব।'

'বলবে ; কেন বলবে ?'

'দেখেছি।...আমার কাছে প্রমাণ আছে।'

'শুনি প্রমাণটা।'

'চিঠি।...নিজের বেলায় বছর পার করে একটা চিঠি লেখ।

তাও আবার কোন রকমে পাঁচ সাতটা লাইন : আমি ভাল আছি, মা বাবা টুলু ভালই আছে। গরু ঘাস খায়, রাম স্কুলে যায়—' পরিহাসের তারল্যে হেসে উঠলাম আমি।

'এই...' মল্লিকা বিছানা ছেড়ে ক্ষিপ্র পায়ে একেবারে সামনে এসে দাঁড়াল। 'আমি এই সব লিখি ?'

'লেখই ত। যত থার্ড ক্লাস চিঠি...। আর চিঠি পাবার বেলায় লম্বা ফার্স্ট ক্লাস চিঠি চাই...'

মলিকা পলকমাত্র সময় দিল না, আমার চুলের মুঠি খপ করে চেপে ধরল। টানল। 'আমার চিঠি থার্ড ক্লাস! নিজে যত বই থেকে চুরি করে করে লেখে তার আবার কথা—'

'চুরি করি!' আকাশ থেকে পড়ার মতন করে তাকালাম আমি।

'করো।' চুলের মুঠি ছেড়ে দিল মল্লিকা।

বিমূঢ় ব্যথিত চোখে কয়েক পলক তাকিয়ে থাকলাম। কি বলব, আমার সততা কেমন করে জানাব বুঝে উঠতে পারছিলাম না। শেষে মুখ থেকে কথাটা আপনিই বেরিয়ে গেল, 'তোমার দিব্যি, আমি একটা কথাও চুরি করি না।'

মল্লিকা কেন যেন কী রকম এক গভীর চোখে সামান্য চেয়ে থাকল আমার দিকে, ঠোঁটের গোড়ায় হাসল সামান্য, বলল, 'একটুতেই লেগে গেল। নিজের ঠাট্টাতে দোষ নেই, অন্যে করলেই একেবারে মুখ কালো হয়ে যায়।' কোমল নিবিড় চোখে চেয়ে থাকল মল্লিকা। তার নরম ছোট হাতে আমার এলোমেলো চুল একটু ঠিক করে দিল। 'দাঁড়াও চিরুনি এনে দি। আমিই না হয় আঁচড়ে দেব। বাব্বা, কী মেঘের মতন হল মুখখানা।'

৭

পরের দিন বিকেলের আলো থাকতে মল্লিকাদের বাড়িতে পৌঁছেছিলাম। আগের দিন মল্লিকা বলে দিয়েছিল, কাল একটু বেলা থাকতে এস। অনেকদিন বাড়ির বাইরে বেরুইনি, তুমি এলে আমাদের পেছনের এই ধানক্ষেত টানক্ষেতে একটু বেড়িয়ে আসব।

মল্লিকার সবে তখন বিকেলের চুল বাঁধা হয়েছে, কলঘরে ঢোকেনি, আমায় দেখে বলল, 'এই কি তোমার বিকেল বিকেল আসা হল!'

'এখনও পাঁচটা বাজেনি।' আমি বললাম।

'বাজতে আর কতক্ষণ, খানিক পরেই দেখবে কেমন ঘোর সন্ধ্যে হয়ে গেছে।'

'তুমি ত তৈরি হওনি!' মল্লিকার দুপুরের শাড়ি, চুল বাঁধার পর তার মুখের তেলতেলে ভাবটা লক্ষ্য করতে করতে আমি বললাম।

'আমার আবার তৈরি হবার কি! যাব ত ওই আমাদের বাড়ির পেছনের মাঠে।'

'এইভাবেই—?'

'না ত আবার কি।' মল্লিকা কিছুমাত্র গ্রাহ্য না করে বলল, 'একটু বস, আসছি।'

আজ আর ভেতরের ঢাকা বারান্দায় বসলাম না। রান্নাঘরের সামনে যে ফাঁকা উঠোন কলতলা কাকাবাবুর টবে সাজান বাগান সেখানে দাঁড়িয়ে থাকলাম। লতাপাতা আর ফুলের গাছ দেখছিলাম। মাটির বড় টবটায় কাকাবাবুর সযত্নের গোলাপ গাছ। একটি লাল গোলাপ পরিপূর্ণভাবে ফুটেছে আর-একটি তখনও কুঁড়ির বাঁধন খুলতে পারেনি। পাশেই হলুদ ছোপ ধরা পাতাবাহারের গাছটা শীতের বাতাসে মৃদু মৃদু কাঁপছিল।

মল্লিকা উঠোনে এসে দাঁড়াল। গায়ের শাড়িটা শুধু পাল্টে নিয়েছে। ঘন নীল রঙের শাড়ি একেবারে ঘরোয়া করে পরা; মুখটা বুঝি শুকনো করে মুছে নিয়েছে। পিঠে স্কার্ফ। হাতে ছোট মতন টর্চ। চশমাটা চোখে পরতে পরতে বলল, 'চল।'

উঠোনের পেছনদিকের দরজা খুলে আমরা বুনো তুলসী আর কাঁটাগাছের ঘন ঝোপের মধ্যে এসে দাঁড়ালাম। ভাঙা তারের বেড়া, কাঁচা কয়লার ডাঁই, বিক্ষিপ্ত আবর্জনা পেরিয়ে আসতে আসতে মেঠো গন্ধটা নাকে লাগছিল।

অল্প একটু জমির পর খানিকটা মাঠ ঢালু হয়ে নেমে গেছে, তারপর ধানক্ষেত। দূরে কলিয়ারির রোপওয়ের পোস্টগুলো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, সেই মাথার তার ধরে ক্রমাগত কয়লা বোঝাই ডুলিগুলো যাওয়া আসা করছিল, আরও দূরে পাকা সড়ক। এবড়ো খেবড়ো মাঠ বিক্ষিপ্ত পাথর পেরিয়ে আমরা ধানক্ষেতে এসে দাঁড়ালাম।

মল্লিকা ঠিকই বলেছিল; বিকেলের আলো কখন যেন চুপিসাড়ে পালিয়ে গেছে। মাঠে ঘাটে কোথাও রোদ কি একটুও পরিষ্কার আলো আর ছিল না। আকাশের তলায় হালকা অন্ধকার। কটা কাক তলায় তলায় উড়ে গেল, অনেকটা দূর দিয়ে একজোড়া সাদা বক ডানা ভাসিয়ে তখন উড়ছিল। পুব কোণে কলিয়ারির পিট-গিয়ার, চিমনি অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছিল।

শীতের ধানক্ষেত ফাঁকা; কাটা ধানের গোড়া নিয়ে পড়ে আছে, মাটিতে ফাটল ধরেছে, কয়েকটা ইঁদুরও বুঝি ওখানে ছোটাছুটি করছিল।

'এখানে বসবে?'

'ওই উঁচু আলটার কাছে চল।' মল্লিকা বলল।

আলের উপর পাশাপাশি বসলাম দুজনে। হু হু করে শীতের হাওয়া বয়ে যাচ্ছিল। এখনও মাঘের এই বাতাস তেমন করে

শীতের কাঁপুনি তুলছে না। মল্লিকা বলল, 'বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারব না। এত দেরি করলে তুমি!'

আমারও মনে হচ্ছিল এই ফাঁকা মাঠ এই হাওয়া এই নির্জনতার সুযোগ বেশিক্ষণ আমি পাব না। নিতান্ত ভাগ্যবশে ঈশ্বর সর্বদিক থেকে আমায় দুর্লভ একটি মুহূর্তের ঐশ্বর্য দিয়েছেন। যে-কথা বলার জন্যে আমি কাশী থেকে ছুটে এসেছি, যা গত কয়েকটি মাস ধরে আমায় বিচলিত বিভ্রান্ত ব্যাকুল করে রেখেছে—আজ এই মুহূর্তে তার একটা স্পষ্ট স্থায়ী সমাধান হয়ে যেতে পারে।

মানুষ যত ভাবে, মনে মনে যত ভেবে নেয়, সময় এলে বুঝি তার শতাংশের একাংশও প্রকাশ করতে পারে না। আমি কাশী থেকে ছুটে এসেছিলাম যতখানি উত্তেজনা নিয়ে, যে সব প্রশ্ন ও কথায় মন বোঝাই করে, আজ এই মুহূর্তে মনে হচ্ছিল সেই কথা বলার অধিকার আমার নেই; হয়ত যোগ্যতাও না। ঠিক কী ভাবে কি কথা দিয়ে শুরু করব, কি বললে মল্লিকা অসন্তুষ্ট হবে না, আমার যন্ত্রণা দ্বিধা সংশয় এবং যথার্থ মনোভাবটি কেমন করে প্রকাশ করা যায় আমি কিছুই বুঝে উঠতে না পেরে দিশেহারা দুর্বল হয়ে পড়ছিলাম।

'কি হল?' মল্লিকা বলল, 'আবার তুমি সেই ঘাড় মুখ গোঁজ করে বসে আছ?'

আমি মুখ মাথা হেঁট করেই বসেছিলাম। বুক ভার ভার লাগছিল, যেন নিশ্বাস আস্তে আস্তে ক্রমশই জমে যাচ্ছিল। মল্লিকার কথা কানে শুনলাম, হেঁট মাথা সোজা করতে পারলাম না।

'মুখ তুলে ভাল করে বস ত—' মল্লিকা বলল, হাত দিয়ে আমার মাথা ঠেলে সোজা করে দিতে চাইল। 'কি, হয়েছে কি তোমার?'

'কিছু না।'

'কিছু না ত অমন মুখ গোমড়া করে বসে আছ কেন?'

'মুখ গোমড়া আর কই—'

'চালাকি! ··কি ভাবছ অত?'

'কিছু না।'

'মিথ্যে কথা।' মল্লিকা অসংকোচে বলল, বলে একটু হাসল, 'তুমি থেকে থেকে এমন ভাবুক হয়ে পড় যে আমার মনে হয় কোনদিন না পাগল টাগল হয়ে যাও।'

সব কথার কোন জবাব থাকে না। নীরবে বসে থাকলাম দূরের দিকে চেয়ে। হালকা অন্ধকার ক্রমশই ঘন হয়ে আসছিল। দূরে দূরে ধোঁয়া জমেছে, কুয়াশা জড়িয়ে আসছে। মাঘের বাতাসও কনকনে হয়ে উঠল।

'কি জানি আমার কিছু ভাল লাগে না।' হঠাৎ কেমন উদাস মৃদু স্বর আমার গলা থেকে বেরিয়ে এল।

মল্লিকা আমার দিকে দু'পলক বুঝি চেয়ে থাকল। বলল, 'কাশীতে তোমার মন টেঁকে না?'

'কিছুই টেঁকে না। না মন না শরীর।'

আমার বিতৃষ্ণা বিরক্তি এত সুস্পষ্ট ছিল যে মল্লিকার বিশ্বাস করতে বাধল না। একটু নীরব থেকে ও বলল, 'কথাটা ত নতুন নয়, এ ত তুমি আগেও বলেছ। তোমার চিঠিতেও কিছু না কিছু এই সব কথা থাকবেই।'

'অকারণে থাকে না।' আমি ক্ষুব্ধ তিক্ত স্বরে বললাম।

'কারণটা কি শুনি।'

'কারণ ত অজস্র। আসলে আমার এই তুচ্ছ কেরানীগিরি—একটা ড্রাজারি মনে হয়। মানুষ কি করে সারাটা জীবন এই ড্রাজারির মধ্যে কাটাতে পারে আমি ভেবে পাই না।'

'তুমি—' মল্লিকা কেমন যেন অদ্ভুত চোখে আমার দিকে চেয়ে

থাকল, তারপর মৃদুস্বরে বলল, 'তোমায় কে বলেছে থাকতে ? আমি হলে হয় এতদিন মন বসিয়ে নিয়ে থাকতাম, না হয়—'

'না হয়— ?'

'মন না বসলে আর কিছু করতাম।'

মল্লিকার কথায় যে সরল স্পষ্ট সমাধান ছিল—সে-সমাধান আমার নয়। এত সহজে আমার পক্ষে এই সমাধানে আসা সম্ভব ছিল না। চাকরির সঙ্গে আমার গুরুজনদের যে আশা প্রত্যাশা জড়িয়ে ছিল, আমায় জীবনের বাঁধা ঘাটে ভিড়িয়ে দিয়ে তাঁরা যে দুশ্চিন্তামুক্ত হয়েছিলেন—আমি সেদিকটার কথা একেবারে উপেক্ষা করতে পারছিলাম না। অথচ এও সত্য এই জীবনের গ্লানি এবং পীড়া আমায় অহরহ দগ্ধ করছিল।

'আমাদের সংসারের কথা ত তুমি জান।' মৃদু গলায় হতাশ স্বরে আমি বললাম।

'জানি।'

'আমায় নিয়ে গুরুজনরা অনেক ভুগেছে।'

'ভোগালে কেন ?'

'ইচ্ছে করে কে ভোগায় !'

তা বাপু তুমি পারো।' মল্লিকা হালকা গলায় আমায় যেন একটু রাগিয়ে দেবার জন্য বলল। দু পলক হাসি হাসি মুখে চেয়ে থাকে তারপর কেমন গম্ভীর হয়ে বলল, 'আমি দেখেছি, সব ব্যাপারে তোমার ভীষণ হ্যাঁ—না আছে। মন শক্ত করে একটা কিছু ধরে নিতে পার না।'

'পারি।' আচমকা দৃঢ় গলায় বললাম।

'পার ? কি পারো— ?'

'চাকরি ছেড়ে, কাশী ছেড়ে আমি আজই পালিয়ে যেতে পারি ; কিন্তু—' অসমাপ্ত কথার পর দূরে প্রায়ান্ধকার শূন্যের দিকে চেয়ে থাকলাম।

'কিন্তু কি—?' মল্লিকা শুধলো।

কিন্তু কি—? কি? কিন্তু যদি তুমি আশ্বাস দাও মল্লিকা, যদি ভরসা দাও, আমি এই কঠিন নির্মম নিষ্ঠুর সংসারে আপ্রাণ সংগ্রাম করে যাব শুধু তোমার যোগ্য হতে। এ কথা যদি আমার জানা থাকে একদিন তোমার মুখে আমার কৃতিত্বের জন্যে হাসি ফুটবে, আমার ঘরে তোমার জন্যে প্রাপ্তির পূর্ণতা ভরে উঠবে, তবে না পারি কি!

মনে মনে আরও কত ভাবলাম কত বললাম কিন্তু মুখ ফুটে এই গোপনতম কথাটি কিছুতেই বলতে পারলাম না। মনে হচ্ছিল এ কথা বলতে গিয়ে আমি আবেগের বশে কি জানি কোন্ বেচাল বেফাঁস সস্তা জলো কথা বলে ফেলব, সেই কথার কী অর্থ মল্লিকা বুঝবে কে জানে, হয়ত অসন্তুষ্ট হবে বিরক্ত হবে, আমার নিভৃত লালিত একটি সুন্দরতম বাসনার মুখের ওপর সে হাসি অথবা তরলতা কালিমা ছিটিয়ে দেবে।

কিছুই বলা হল না। অন্ধকার গাঢ় হয়ে আসছিল। ধোঁয়া এবং কুয়াশার জাল ক্রমশই ফাঁকা ধানক্ষেতের শূন্যতাকে ভরে দিচ্ছিল। আকাশে তারা উঠল। ডিসেম্বরের শীতের উত্তরে হাওয়া আমাদের সর্বাঙ্গে শিহরণ তুলছিল।

'চল।' মল্লিকা বলল। আল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। স্কার্ফটা গায়ে ঘন করে জড়িয়ে নিল।

তার হাতের ছোট টর্চ সামনের রুক্ষ ফাটা ফাঁকা মাঠের ওপর মৃদু আলো ফেলে দুলতে দুলতে এগিয়ে চলল। সামনে ঘন কুয়াশা। যেন আমাদের দু-জনকে এই কুয়াশা সমস্ত সংসার থেকে আলাদা করে ঢেকে নিয়েছে।

আমরা দুজনই নীরব। দুজনেই যেন বেহুঁশে পথ চলেছিলাম। কখন একসময় বুনো তুলসীর ঘন গন্ধ নাকে লাগল। মল্লিকাদের বাড়ির কাছে পৌঁছে গেছি।

হাতের টর্চটা একবার আকাশের দিকে তুলে মল্লিকা আমায় কি একটা তারা চেনাবার চেষ্টা করল। হাসল। বলল, 'আমি কি বোকা, টর্চের আলো দিয়ে তোমায় তারা দেখাচ্ছি।' হাত নামিয়ে নিল মল্লিকা, একটু হাসল। খুব মৃদু অস্পষ্ট গলায় বলল, 'পাগলামি করো না। যা করবে ভেবে চিন্তে কর। কে না উন্নতি চায়। আশা রাখতে দোষ কি।'

পিছনের দরজা খুলে আলোকিত উঠানের মধ্যে দাঁড়ালাম।

১.

তোমার কাছে আমার অনেক ঋণ। অন্তত এই ঋণটুকু স্বীকার করি মল্লিকা, তুমি আমায় অন্ধকূপ থেকে তুলে নিয়েছ। হাত বাড়িয়ে ডুবন্ত মানুষকে উদ্ধার করার মতন করে নয়। তবু তুমিই তুলেছ আমায়। তোমায় ভালবেসে আমি নিজেকে প্রাণপণে ওঠাবার চেষ্টা করেছি, তোমায় ভালবেসেছি এই বোধ আমায় শক্তি-সাহস দিয়েছিল, আমার ক্লান্ত মৃত মনকে আবার জাগিয়ে তুলেছিল।

তুমি আর আমি তখন নদীর এ-পার ও-পারে দাঁড়িয়ে। আমাদের মধ্যে কোন সেতু ছিল না। আমি বুঝতে পেরেছিলাম, এই সেতু আমায় তৈরি করে নিতে হবে। চল্লিশটাকার উঞ্ছবৃত্তি, নিতান্ত নগণ্য এই পরিচয়, এই প্রাত্যহিক দাহ মনোপীড়ন ক্ষোভ হতাশা দিয়ে আমি তোমার কাছে পৌঁছতে পারব না।

নিজেকে তোমার যোগ্য করার জন্যে আমি তখন অন্ধ পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। কি করলে যোগ্য হওয়া যায় জানতাম না। মানুষ যেমন ধাঁধায় পড়ে পথ হাতড়ায়—আমি শুধু তেমনি করে পথ হাতড়াচ্ছিলাম। দুটো বছর এই করে কাটল, কাশী ছাড়লাম, রেল-কেরানীগিরি ছাড়লাম, আরও একটা জুটেছিল তাও ছাড়লাম।

আবার কলকাতা। পায়ের তলায় মাটি পাবার জন্যে তখন লড়ছি। না, আমার মনে কষ্ট ছিল না, ভয় ছিল না, দ্বিধা ছিল না। সে যে এক কিসের মোহ-আকর্ষণ আমায় আচ্ছন্ন করে রেখেছিল—বোঝানো মুশকিল। আশা—আশা—আশা। তোমার আশা আমার সব কষ্ট কৃচ্ছ্রতা ভুলিয়ে রেখেছিল। আমার স্বপ্নে

তুমি একটি মাত্র নক্ষত্রের মত জ্বলতে। আর আমার মনে হত, এই দুঃখ এই কষ্টের একদিন শেষ হবে।

একে কি বলে? ভাগ্য? হয়ত ভাগ্যই। এমন দিনে মল্লিকারা কলকাতায় এল। গ্রে স্ট্রীটের গলিতে আবার দেখা হল। আচমকা পথে দেখা নয়। চিঠি দিয়ে দেখা করতে বলেছিল।

অনেক দিন পরে ওকে দেখলাম। অনেক রোগা হয়ে গিয়েছে, শরীরের লাবণ্য মরে যাচ্ছে, অসুস্থ অসুস্থ দেখাচ্ছিল, মুখটা শুকিয়ে গেছে, চোখে কেমন একটা অশান্তি।

কিছু এলোমেলো কথার পর মল্লিকা মাথার দিকের জানলার পরদাটা টেনে দিলে। ফ্ল্যাটবাড়ির বারান্দার ওপাশে একটি মেয়ে বুক ঝুঁকিয়ে ঝুলছিল।

ঘরে তখন মল্লিকা আর আমি। এঁটো চায়ের পেয়ালায় সিগারেটের ছাই জমছে। বিকেল ফুরিয়ে এল। ঘরটা ছায়া-ছায়া। বাইরে গলিতে কারা বুঝি ঝগড়া করছিল।

'কলকাতাতেই থাকবে এখন?' আমিই কথা বললাম। চুপচাপ ঘরটা কেন যেন বড় গুমোট হয়ে উঠেছিল।

'ঠিক নেই। হয়তো টুলু আর মা থাকবে। আমি ফিরে যাব।'

'তুমিও থেকে যাও।'

'বাবা একলা থাকবেন, কষ্ট হবে…।' একটু চুপ করে থাকল মল্লিকা। 'কে জানে তোমাদের এত কি ভাল লাগে কলকাতা, আমার ভাল লাগে না মোটে।'

'ফাঁকায় থাকা অভ্যেস তোমার—এই গোলমাল হৈ চৈ সহ্য হয় না।'

মল্লিকা কি ভাবছিল; বলল, 'ছেলেবেলায় যখন দিদিমার কাছে থাকতুম তখন ত ভালই লাগত।'

'ছেলেবেলার কথা আলাদা, তখন সবই ভাল লাগে—' কথাটা

বলতে বলতে বলতে হঠাৎ আমি থেমে গেলাম। ছেলেবেলার মল্লিকাকে ঝাপসা ছবির মতন মনে পড়ল।

মল্লিকা গলার কাছে হাত বোলাচ্ছিল। চোখের দৃষ্টি আমার ওপর। ঘোলাটে অন্ধকার ঘরে ওর চশমা মুখটাকে আরও যেন গম্ভীর করে তুলেছে।

খানিকক্ষণ নীরবে কাটল। তারপর মল্লিকা গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বলল, 'তোমার ব্যবসা কেমন চলছে?'

'ব্যবসা!'

'শুনছিলাম যে! চিঠিতেও লিখেছিলে কি যেন প্রেসট্রেস করেছ।'

'আমি করি নি; আমার এক বন্ধু করেছে—আমি তার দেখাশোনা করি।'

'চাকরি?' মল্লিকা যেন আরও স্থির চোখে তাকাল আমার দিকে।

'তা এক রকম চাকরি। তবে আমিই সব—'

'মানে সব ঝঞ্ঝাট-ঝামেলা তোমার।'

'স—ব। সারাদিন প্রেসে কাটে। ওখানেই একটা ঘরে থাকি। চাকর আছে একটা রেঁধে দেয় দুমুঠো।' আস্তে আস্তে ক্লান্ত স্বরে আমি বললাম।

মল্লিকা কোনো কথা বলল না। গায়ের আঁচলটা গলায় জড়াল, খুলল। আমার মনে হচ্ছিল, একটা কথা যেন আমরা দুজনেই অস্পষ্ট রেখে যাচ্ছি। ইচ্ছে করেই। অস্বস্তি লাগছিল, আমার ক্ষোভ জমছিল।

'এই প্রেসের মালিক অবশ্য অমূল্য, কিন্তু আমাদের মধ্যে একটা এমনি কথা আছে, আমায় ও পার্টনার করে নেবে।' হঠাৎ কেন যে এই কথাটা তখন বলা উচিত মনে করলাম, জানি না।

অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে মল্লিকা একটু হাসল। বলল, 'শেষ পর্যন্ত ঠকবে না ত।'

'ঠকবো! না। অমূল্য আমায় খুব ভালবাসে।'

'যারা খুব ভালবাসে তারাই আবার ভীষণ ঠকায় কি না!' মল্লিকা দেয়ালের দিকে চোখ ফিরিয়ে নিল।

ঘর অন্ধকার হয়ে এসেছিল। ফ্ল্যাট বাড়ির বারান্দায় গা-বুক ঝুঁকিয়ে বুঝি সেই মেয়েটাই গান করছিল। নীচের রাস্তা হঠাৎ শান্ত হয়ে গেছে। ঘরের মধ্যেও প্রায় বুক-চাপা নীরবতা।

মল্লিকা নড়েচড়ে উঠে দাঁড়াল। মৃদু অস্পষ্ট ক্ষুন্ন গলায় বলল, 'দু-বছর ধরে এই কলকাতায় পড়ে থাকলে, কি যে তুমি করলে তুমিই জানো।'

এইটু পরেই ঘরে আলোর ঝাপটা এল। বাতি জ্বালিয়ে দিয়েছে মল্লিকা।

'বসো একটু, আমি আসছি।' মল্লিকা চলে গেল।

আলো-জ্বালা ছোট ঘরে বসে থাকলাম। ব্লটিং পেপারে কালি শোষার মতন কে যেন আমার মনের সুখ স্বস্তি শুষে নিয়েছে। কেমন শূন্য ভার ভার লাগছিল। যেন দু-হাতে হাতড়েও আমি ধরার মতন কিছু পাচ্ছিলাম না। কি করেছি আমি এই দু বছর? কি? ছেঁড়া চটি পরেছি, ময়লা জামা পরেছি, হয়ত এক পেয়ালা চা খেয়ে সারা বিকেল কাটিয়েছি, তুচ্ছ কিছু কাজ করেছি, তারপর এই প্রেসের ম্যানেজারি। কি হয়েছে এতে? আমার কতটুকু গৌরব বেড়েছে। কাশীর সেই চল্লিশ টাকার কেরানীর চেয়ে এই আশি টাকার ম্যানেজারি, কোন দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ?

কোনো দিক দিয়েই শ্রেষ্ঠ নয়। মানুষের মনে যে নির্মোহ সমালোচক থাকে, সে বলছিল, কাশীর কেরানীগিরি আর এই কলকাতার প্রেস-ম্যানেজারি এ দুইয়ে কোন তফাত নেই। দুইই

উঞ্ছবৃত্তি, ইতর কর্ম। অর্থের বিচারে হয়ত বলা যায়, উপার্জন কিঞ্চিৎ বেশি হচ্ছে। কিন্তু একে কি উপার্জন বলে? যুদ্ধের ডামাডোলে নিতান্ত অপদার্থও শ'—দুশোর মুখ দেখেছে, যুদ্ধান্তে আজও তার জের কাটে নি। আর তুমি? আশি টাকায় ইমারত গড়ছ। ছি, ছি···

না, কাশী আর কলকাতার তফাত দেখতে পাচ্ছিলাম না। কিন্তু নির্মোহ সমালোচককে অপসৃত করে কাতর ক্ষুণ্ণ আহত মন বলছিল, তফাত আছে। তুমি গড্ডালিকায় ভেসে যাও নি; তুমি পারিবারিক কুশলকামীদের কৃপাদত্ত ক্ষুদ্র ভাণ্ডার থেকে জীবনের রসদ নিচ্ছ না। যা করেছ, করছ—এ তোমার নিজস্ব, তোমার সত্তার মুক্তি। এ-জীবন তুমি স্বহস্তে রচনা করছ। এর কি গৌরব নেই? এই যে দুঃখ যাতনা সওয়া, এই যে নিরন্তর চেষ্টা—এর কি কোনো মূল্য নেই? আছে। টাকার কম বেশির হিসেব এখানে অচল। যে ফুল ফোটায় আর যে ফুল বেচে তাদের মনোবৃত্তি এক নয়। তুমি ত ফুল বেচতে নামোনি।

আরে, এ-সব কিছু না, কিছু না। আবেগ আর হৃদয়-দৌর্বল্য দিয়ে ফাঁপা ফাঁকা সান্ত্বনা সৃষ্টি করা। আসলে, শ্যামল, তুমি জানতে না কি চাও তুমি, কতটুকু তোমার ক্ষমতা, ঝোঁকের মাথায় নিজের কাছে বাহাদুরি নেবার জন্যে, এবং মল্লিকার কাছে তোমার কৃতিত্ব দেখাবার জন্যে একটা ছেলেমানুষি করেছ, কেরানী-গিরি ছেড়েছ! তুমি মূর্খ! মূর্খ···।

নিজের মুখ-মাথা কখন যে নীচু হয়ে এসেছে বুঝতে পারি নি। ঘাড় হেঁট করে ভাবছিলাম, কি করেছি আমি এই দু-বছর, কোন কাজ—যার মূল্য আছে, গৌরব আছে, সুখ আছে? এ যেন তৃণতরুহীন ধু ধু মাঠে একটি গাছের আশ্রয় খোঁজা।

মল্লিকা এল।

'ঘাড়-মুখ গুঁজে বসে আছ যে!'

মাথা তোলার ইচ্ছে করছিল না। ঘাড়ের কাছটা ব্যথা করছিল। মাথাটাও যেন ধরে উঠেছে।

'খুব হয়েছে···নাও, ঠিক হয়ে বসো। তোমার ওই কথায় কথায় ঘাড় গোঁজ করা আমার ভাল লাগে না।' মল্লিকা আমার পাশে এসে কপালে ধরে মুখ তুলে দিল। এই প্রথম তার হাতের স্পর্শ লাগল আমার কপালে চুলে ; তার বুকের মমতা যেন চিবুকে অনুভব করলাম। একটুক্ষণ সে কাছে ছিল, তারপর সরে গেল।

'তুমি ভীষণ বোকা, বোকা বলেই যত ভয়।' মল্লিকা জানলার কাছে দাঁড়িয়ে বলল।

কোনো জবাব ছিল না আমার। খানিকটা সময় কেউ কোনো কথা বললাম না। শেষে আমি উঠলাম।

'চলি।'

'বসো না আর একটু।'

'না, আজ থাক। কাজ আছে একটু।'

'কাল আসবে ?'

'কাল !'

'সন্ধ্যের দিকে ত কাজ থাকবে না। এসো।' মল্লিকা নরম মধুর গলায় বলল।

২.

এই যাওয়া নিত্য হয়ে উঠল। কোনও কোনও দিন কাকিমা অনেকক্ষণ বসে থাকতেন, গল্প করতেন, তারপর এক সময় উঠে যেতেন ; টুলু বড় একটা কাছ ঘেঁষতে চাইত না। মল্লিকা আর আমি বসে বসে গল্প করতাম। সে-সব গল্পের অধিকাংশের কোনো মাথা-মুণ্ডু ছিল না। তবু আমরা প্রত্যেকটি কথায় সুখ পেতাম,

আনন্দ অনুভব করতাম। এক-একদিন ঝগড়াও বেধে যেত, অভিমানের ঝগড়া কিংবা নেহাত ছেলেমানুষির।

একদিন সন্ধ্যেবেলা গিয়ে দেখি মল্লিকা বসে বসে কি একটা বই পড়ছে। পায়ের সাড়ায় এক পলক চোখ উঠিয়ে দেখল, আবার বইয়ের পাতায় চোখ ডোবাল।

'কি খবর?' সহাস্যে ভূমিকা সেরে বসে পড়লাম।

কোন জবাব নেই। মনে হল, হয়ত বইয়ের এমন একটা খাপছাড়া জায়গায় ওর মন আটকে আছে যে একটু স্বস্তি পাবার মতন অবস্থা না হলে আর চোখ তুলবে না। অপেক্ষা করতে লাগলাম। মিনিট পাঁচেক কেটে গেল, পাতা ওলটাবার শব্দ শুনতে পেলাম, তবু মল্লিকার না-কথা না-লক্ষ্য।

'কি এত গোগ্রাসে পড়ছ?'

জবাব নেই। গ্রাহ্যও করল না। যেন এ-ঘরে আমি নেই। ঝুঁকে ওর মুখ লক্ষ্য করার চেষ্টা করলাম। ঠিক দেখা গেল না। বই দিয়ে আড়াল করে রেখেছে।

নেহাত ছেলেমানুষি করে উঠে গিয়ে বইটা কেড়ে নিলাম। মল্লিকা বিরক্ত হয়ে তাকাল। মুখ থমথম করছে।

'বই দাও।' ছোট করে বলল মল্লিকা। ধমকের সুরে।

'পরে পড়ো। একজন ভদ্রলোক এসে বসে রয়েছে সামনে বোবা হয়ে, আর উনি বই পড়ছেন।' পরিহাস ভিন্ন অন্য কোনো সুর আমার গলায় ফুটল না।

'ভদ্রলোকের জন্যে কি করতে হবে আমায়? পা ধুইয়ে দেব?' রুক্ষ তীক্ষ্ণ শোনাল ওর গলা।

'আরে বাব্বা! সাংঘাতিক চটে রয়েছ যে! কি ব্যাপার!'

'কোনো ব্যাপার নয়, বই দাও।' মল্লিকা হাত বাড়াল।

'দিচ্ছি। আগে একটু চা খাওয়াও।'

'আমি পারব না। মাকে গিয়ে বলো।' রূঢ় গলায় ও বলল।

'মা কেন, তুমিই ত রয়েছ।'

'তোমার চাকর আমি।' মল্লিকা এমন ভাবে দাঁত চেপে, গালের পাশে অসহ্য বিরক্তির এবং ঘৃণার ভাব করে দপদপে চোখে কথাটা বলল যে আমি স্তব্ধ হয়ে ওর মুখের দিকে কয়েক পলক চেয়ে থাকলাম। এত কুশ্রী ইতরভাবে কথা বলতে কোনোদিন দেখি নি ওকে। নিজেকে সেই মুহূর্তে অসহ্য অপমানিত মনে হল। মাথায় দপ করে যেন রাগটা জ্বলে উঠল, সেই জ্বালা সারা গায়ে ছড়িয়ে গেল। কি বলব, কি করব বুঝতে পারছিলাম না। আমার বোধবুদ্ধি লোপ পেয়েছিল। তারপর আচমকা বইটা টান মেরে ছুঁড়ে দিয়ে বাইরে চলে এলাম। সিঁড়ি ভেঙে সোজা রাস্তায়। রাস্তায় নেমে অনুভব করলাম, হাত পা কাঁপছে, কান গরম, কপালের দুটো পাশ দপ দপ করছে।

আশ্চর্য! কি ভাবে মল্লিকা আমাকে! কি ভাবে! আমি কি ছ'পয়সার চায়ের জন্যে তার বাড়িতে গিয়ে ধরনা দিই? না কি, তার হাতের চায়ের চেয়ে ভাল চা আমি খেতে পাই না। কি মনে করে মল্লিকা! তোমার কাছে রোজ যাই বলে তুমি আমায় কাঙাল পেয়েছ, ভাবছ তোমার কাছে গিয়ে বসে থেকে আমার জীবন সার্থক হয়ে যাচ্ছে! এ-অপমান করার অধিকার তোমায় কে দিল? কে?

সামনে দিয়ে রিকশা যাচ্ছিল। উঠে বসলাম। শপথ করলাম, আর যাব না। মল্লিকাদের বাড়ি আর যাব না।

সারাটা সন্ধ্যে ছটফট করে কেটেছে। মল্লিকার হৃদয়হীন রুক্ষ ব্যবহার কিছুতেই ভুলতে পারছিলাম না। এমন ইতর অপমানকর কথা সে কি করে বলতে পারল আমার মাথায় আসছিল না। ···প্রেসের ঘরে ফিরে এসে দেখলুম অমূল্য এসেছে, আরও কয়েকজন বন্ধু বান্ধব আড্ডা মারছে। অন্য দিন হলে অনায়াসে আনন্দে এদের আড্ডায় মজে যেতে পারতুম। সেদিন ওদের উপস্থিতি

অসহ্য লাগছিল। মনে হচ্ছিল, এখান থেকে ওদের হাঁকিয়ে দিই। অমূল্যর সঙ্গে সামান্য একটা কথায় এমন রূঢ় ব্যবহার করলুম, যা আমার করা উচিত হয় নি। অমূল্য কিছু বলল না। কিন্তু দুঃখ পেয়েছে বুঝতে পারছিলাম।

রাত্রে আর ঘুম আসে না—আসে না। ফিরে ফিরে শুধু আজকের ঘটনা মনে পড়ছিল। মল্লিকার রূঢ়তার কোনো কার্য কারণ সম্পর্ক খুঁজে না পেয়ে আমার ধারণা হচ্ছিল, হয়ত ওর স্বভাবে এই দম্ভ, নির্মমতা, ইতরতা লুকিয়ে ছিল—যা আমি জানতে পারি নি। আজ ঘটনাক্রমে জানলাম। ওর কি ধারণা কে জানে? তবে, এমন যদি ভেবে থাকে—আমাদের ঘনিষ্ঠতার সুযোগ নিয়ে সে সৌজন্যের সীমা ছাড়াবে, আমার প্রাপ্য সম্মান দেবে না—তবে ভুল করেছে। আমি ভালবাসার জন্যে আত্মমর্যাদা খুইয়ে দিতে রাজী নয়। তোমার পোষা কুকুর বেড়াল আমি নই, মল্লিকা। আর যাই হোক, আশি টাকার প্রেস ম্যানেজারির মধ্যে এমন কোন অগৌরব নেই যে, তোমার ধমক উদাসীনতা অবজ্ঞা সহ্য করেও আমায় মুখ বুজে থাকতে হবে।

পরের দিন সকালেই টুলু এসে হাজির। চিঠি দিয়েছে মল্লিকা।

'ও-চিঠি তুই নিয়ে যা।'

'আরে ব্বাস্, তা হলে মেরেই ফেলবে দিদি।'

'রাস্তায় ফেলে দে।'

'তারপর দিদি যখন জিজ্ঞেস করবে।'

'বলবি দিয়েছিস।'

'সে যা বলার তুমি বলো, আমি দিয়ে গেলাম।' টুলু টেবিলের ওপর চিঠি রেখে তরতর করে রাস্তায় নেমে গেল।

শেষ পর্যন্ত খাম ছিঁড়ে চিঠিটা পড়ে ফেললাম। 'কালকের ব্যাপারের জন্যে আমায় ক্ষমা কোরো। কাল আমার মনের

অবস্থা ভাল ছিল না। তোমায় বলব। আজ সকালে একবার এসো।'

যাব না। তোমার মনের অবস্থা জেনে আমায় যেতে হবে মন তোমার একার, আমার নয়।

সারাটা সকাল যেন কাঁটা বিঁধে থাকল মনে, চিঠিটা বুক পকেটে মল্লিকার নরম আঙুল হয়ে টানছিল। ওর করুণ মিনতি-ভরা চোখ থেকে থেকে ভেসে উঠছিল মনে। অথচ কোন এক আত্মমর্যাদায়, অভিমানে আমি এই দুর্বলতা ঠেকিয়ে রাখলাম।

বিকেলে টুলু আবার এল। মুখটা খুব প্রসন্ন নয়। পকেট থেকে একটা খাম টেবিলে ফেলে দিয়ে বলল, 'জবাব আমি নিয়ে যেতে পারব না। আমি এখন সাঁতার দেখতে যাচ্ছি।'

'জবাব! জবাব দিতে হবে নাকি?'

'জানি না। এখানে তুমি খিঁচিয়ে উঠবে, ও-দিকে দিদি তেড়ে উঠবে—ও-সব তোমাদের ঝগড়াঝাটিতে আমি নেই।...কই, আমার সেই খাতা কি হল?' টুলু টেবিলের ওপরটা হাতড়ে নিল।

'কাল-পরশু আনিয়ে দেব।'

'তুমি যেয় সন্ধ্যেবেলা, আমি চললাম।' টুলুর আর তর সইছিল না। শার্টের হাতায় কপাল মুছতে মুছতে রাস্তায় নেমে গেল।

কয়েক মুহূর্ত চিঠি হাতে বসে থাকলাম। সামনের রাস্তা দিয়ে একটা বাস চলে গেল, ছাপাখানার মেসিনটা চলছে, একঘেয়ে পরিচিত ক্লান্তিকর একটা শব্দ, রাস্তা থেকে কাগজ-পোড়া একটু গন্ধ ভেসে এল।

চিঠিটা খুলে ফেললাম। সামান্য উত্তেজনা অনুভব করতে পারছিলাম, কেমন বিচিত্র এক সুখ, হয়ত জেতার সুখ, জয়ের গর্ব।

'যদি না আসবে জানালে না কেন? আমি সারা সকাল

বসে থাকলাম। খারাপ ব্যবহার শুধু একা আমিই করি না, অন্যেও করে। সন্ধ্যে' লা নিশ্চয় এস। আর কখনও তোমায় কিছু বলব না।'

পেনসিলে লেখা অক্ষরগুলো স্পষ্টতা হারিয়ে কখন যেন অস্পষ্ট ঝাপসা হয়ে এল। একটি ম্লান অভিমানী ক্ষুব্ধ মেয়ে মুখ নিচু করে বসে আছে—দেখতে পাচ্ছিলাম। বুকটা ভার হয়ে উঠছিল। দীর্ঘনিশ্বাস গলার কাছে এসে জমছিল।

'এই নাও চা। আরো আছে।' মল্লিকা চায়ের পেয়ালা হাতে দিল।

হাত বাড়িয়ে কাপটা নিলাম। আড়ষ্ট লাগছিল। লজ্জা। মল্লিকা ঘরের একপাশে গিয়ে দুটো ধূপকাঠি নিল। 'দেশলাইটা দাও তোমার—' কাছে এল ও, দেশলাই জ্বালিয়ে ধূপকাঠি ধরাল, ওপাশে দেওয়াল-তাকের ওপর ধূপদানিতে রাখল। মল্লিকার ব্যবহারে সরল কৌতুক ফুটে উঠছিল। মনেই হয় না, গতকাল এবং আজের মধ্যে—ওর এবং আমার মধ্যে—একটা কিছু ঘটে গেছে। মল্লিকা মুখোমুখি বসল। ছাপা পাতলা শাড়ি, সাদা ব্লাউজ, কেন যেন আজ আর খোঁপা বাঁধে নি, এলো করে ঘাড়ের কাছে গুটোনো।

'আরও আছে চা।' মল্লিকা সরাসরি তাকাল। চাপা হাসিতে চোখ ভরা।

'এটাই আগে শেষ করি।' স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করলাম।

'শেষ করি মানে, শেষ করতেই হবে। তারপর আরও তিন পেয়ালা আছে—'

'তিন পেয়ালা—?' অবাক চোখে চাইলাম।

'আজকের সকালেরটা, কাল সন্ধ্যের আর পরশুর—'

'পরশু?'

'পরশুরটা কে খাবে ?'

'পরশু ত আমি আসি নি।'

'আসার কথা ছিল। বলে দিয়েছিলাম না আসতে। মাথা নেড়ে তখন খুব ত হ্যাঁ করে গেলে, তারপর দেখা নেই।...অথচ সেদিন সন্ধ্যেবেলা তোমার জন্যে......' মল্লিকা হঠাৎ থেমে গেল। মুখের হাসির রঙ যেন প্রথমে জলে ধুয়ে ধুয়ে ফ্যাকাশে ান হল, তারপর আস্তে আস্তে কালচে স্লেটের মতন মলিন নিষ্প্রাণ হয়ে গেল।

আমি বোকার মতন সেই বিষণ্ণ আহত থমথমে মুখের দিকে চেয়ে থাকলাম কয়েক পলক। বিমূঢ় বোধ করছিলাম। বুঝতে পারছিলাম না, কি হয়ে থাকতে পারে! পরশু না এসে এমন কোন অন্যায় করেছি! এমন ত কত দিনই আসতে পারি না, কই কখনও এ-কথা শুনি নি ওর মুখে। বিভ্রান্ত বোধ করে নীরব থাকলাম। অপেক্ষা করতে থাকলাম পরের কথাটুকু শোনার জন্যে।

মল্লিকা কিছু বলছিল না। মুখ জানলার দিকে ফিরিয়ে থাকল।

'পরশু আসতে পারলাম না।' মৃদু অনুতপ্ত গলায় বললাম।

সঙ্গে সঙ্গে মল্লিকা জবাব দিল না। একটু পরে বলল, 'মনে ছিল না ?'

'ছিল।'

'তবে ?'

'অমূল্য এসেছিল। ওর সঙ্গে এক জায়গায় গেলাম। ফিরতে রাত হয়ে গেল।'

মনে হল মল্লিকা কান পেতে প্রত্যেকটি কথা শুনল। একটু চেয়ে থাকল আমার দিকে, চোখ ফিরিয়ে দেওয়াল-তাকের দিকে তাকাল। তারপর অর্ধস্ফুট গলায় বলল, 'তুমি এলে ভাল করতে।'

সমস্ত ঘর হঠাৎ যেন ভীষণ নিস্তব্ধ হয়ে উঠল। বাতাস ভারী। ধূপের গন্ধটা এল কি এল না। আলোর উজ্জ্বলতা বোঝা যাচ্ছিল না। আমার আঙুলগুলো ব্যথা করে উঠল। বুকের তলায় যেন একটা পাতলা ভিজে গেঞ্জির ঠাণ্ডা লাগছিল।

'তুমি তো জরুরী কিছু আছে বলে দাও নি।' আমি আড়ষ্ট গলায় বললাম।

'বলেছিলাম, বুঝতে পার নি।'

'কি হয়েছে?'

'এখন আর শুনে তোমার লাভ হবে না।'

'তবু শুনি।'

'না।'···একটু চুপ করে থাকল মল্লিকা। চশমাটা খুলে আঁচলে মুছতে লাগল। নত মুখে। বলল, 'আমি কাল কি পরশু বাবার কাছে যাচ্ছি।'

কথাটা যেন আমার কানে যায়নি। বোধ এবং চিন্তাকে কিছুতেই বিমূঢ়তার নিষ্ক্রিয়তা থেকে উদ্ধার করতে পারছিলাম না।

'তুমি অনেক দিন বাড়ি যাও নি!···এবার পুজোর সময় এস।' মল্লিকা আলোর দিকে তাকিয়ে মৃদু গলায় বলল।

'তুমি যাবে?'

'যাব।'

'বেশ, আমিও যাব।'

মল্লিকা উঠল। কাছে এল, 'দাও পেয়ালাটা, তোমার কালকের রাগটা পুষিয়ে দি।' ম্লান হাসল মল্লিকা। হাসিটা শাঁখের মত সাদা। নিষ্প্রাণ।

৩.

যেখানে শুরু সেখানে শেষ করার জন্যে মল্লিকা আমায় টেনে এনেছিল। হয়ত তাও নয়। হয়ত এতকাল যা ভূমিকা

হিসেবে কেবল বিস্তৃত ও প্রসারিত হয়ে যাচ্ছিল তার বিরক্তি এবং আসলের শুরু চাইছিল মল্লিকা। ঠিক জানি না, সে কি চেয়েছিল।

ঈশ্বর আমাদের প্রতি সদয় ছিলেন। যে-অবসর যে-পরিবেশে আমাদের স্বপ্ন শুরু হয়েছিল সেই অবসর এবং সেই পরিবেশই ফিরে পেলাম।

দশমীর আকাশ যুঁই ফুলের মতন সাদা হয়েছিল, মৃদু মন্থর স্রোতের মতন জ্যোৎস্না বয়ে যাচ্ছিল। স্নিগ্ধ শান্ত ঘুমিয়ে-পড়া মাঠের জ্যোৎস্না মাড়িয়ে মাড়িয়ে আমরা হাঁটছিলাম। একটি দুটি পাতা খসে পড়ছিল গাছ থেকে, শীত-শীত হাওয়া আসছিল।

'তুমি, আজ একের পর এক এ-সব করছ কি?' আমি বললাম।

'কি?'

'আমায় একেবারে আশীর্বাদে প্রণামে শান্তিজলে রীতিমত ধার্মিক বানিয়ে তুললে।'

'মানে?'

ঈষৎ নীরবতা। মাঠঘাট জ্যোৎস্নায় ঝিমঝিম করছে। মনে হচ্ছিল, এমন জ্যোৎস্না আর দেখিনি, দেখব না।

'বিসর্জনের সময় কোথা থেকে ছুটে এসে তোমাদের ওই আরতির কি বলে তাপ না ভাপ—আগুনের সেঁক লাগিয়ে দিলে।'

'ওটা নিতে হয়, সকলে নিচ্ছিল দেখলে না। ওতে ভাল হয়।'

'ভাল হয় না কলা হয়। মাঝের থেকে সকলে দেখল তুমি—'

'দেখুক।'

'তুমি কতটা শান্তিজল মাথায় ঢেলেছ?' তরল গলায় বললাম।

'ঢালব কেন, ছিটেফোঁটা যা পেয়েছি তাই।'

'আমার মাথায় তোমার শিবঠাকুরের ঘটিটাই ত উপুড় করে দিলে।'

'ভাগ···মিথ্যে কথা বল না।' মল্লিকা বালির ঢিবির পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে দূরে পুকুরটার দিকে তাকাল একবার। এই পুকুরে ঠাকুর বিসর্জন হয়ে গেছে মাত্র কয়েকঘণ্টা আগে। এখনও বোধ হয় সব মাটি গলে যায় নি। 'তুমি শান্তিজলের সময় পালিয়েছিলে কেন, ছু-কোঁটাতেই হয়ে যেত।'

'এ-সব আমার ভাল লাগে না।'

'কি, এই আরতির তাপ, শান্তিজল, প্রণাম···'

'প্রণামটা বাদে।' মল্লিকার দিকে তাকালাম, হালকা নীল রঙের শাড়িটা চাঁদের আলোয় ধোয়া ধোয়া দেখাচ্ছে। মল্লিকার মুখে যেন প্রতিমার মুখের মতন ঘাম তেল মাখানো। জ্যোৎস্নার নরম মিহি মায়া। 'আজকের দিনটা চিরকাল মনে রাখব।' ঈষৎ লঘু সুরেই বুঝি বলতে চেয়েছিলাম, কিন্তু অন্যরকম শোনাল, গভীর ঘন নিবিড় কথার মতন।

'তুমি বড়, তোমায় প্রণাম করতে দোষ কি!' মল্লিকা আরও কাছে সরে এল।

'এতদিন ত করো নি।' কৌতুকের চোখে মল্লিকার দিকে তাকালাম।

কথার জবাব দিল না মল্লিকা। কতক ভাঙা ইঁটের স্তূপ কাটিয়ে আমরা বালি-বালি মেঠো পথ দিয়ে হাঁটতে লাগলাম। দূরে কোথায় একটা বুনো পাখি ডেকে উঠল, থামল, আবার ডাকল।

'এতদিন দরকার হয় নি।' মল্লিকা আচমকা বলল। আমি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম কোন কথার জবাব দিচ্ছে ও। তাকালাম, মল্লিকা সোজাসুজি চেয়ে আছে, মাঠ গাছ ক্ষেত আর জ্যোৎস্না-ধারার দিকে। আচ্ছন্ন বিষণ্ণ স্বরে বলল, 'ভাবতাম একদিন ত প্রণাম করতেই পারব, তাই আর···'

কথা যেন মাঝপথে থেমে গেল। আমি অধৈর্য হয়ে উঠে-ছিলাম বুঝি। দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। চেতনার সরোবরে আচমকা

হিসেবে কেবল বিস্তৃত ও প্রসারিত হয়ে যাচ্ছিল তার বিরতি এবং আসলের শুরু চাইছিল মল্লিকা। ঠিক জানি না, সে কি চেয়েছিল।

ঈশ্বর আমাদের প্রতি সদয় ছিলেন। যে-অবসর যে-পরিবেশে আমাদের স্বপ্ন শুরু হয়েছিল সেই অবসর এবং সেই পরিবেশই ফিরে পেলাম।

দশমীর আকাশ যুঁই ফুলের মতন সাদা হয়েছিল, মৃদু মন্থর স্রোতের মতন জ্যোৎস্না বয়ে যাচ্ছিল। স্নিগ্ধ শান্ত ঘুমিয়ে-পড়া মাঠের জ্যোৎস্না মাড়িয়ে মাড়িয়ে আমরা হাঁটছিলাম। একটি-দুটি পাতা খসে পড়ছিল গাছ থেকে, শীত-শীত হাওয়া আসছিল।

'তুমি, আজ একের পর এক এ-সব করছ কি ?' আমি বললাম।

'কি ?'

'আমায় একেবারে আশীর্বাদে প্রণামে শান্তিজলে রীতিমত ধার্মিক বানিয়ে তুললে।'

'মানে ?'

ঈষৎ নীরবতা। মাঠঘাট জ্যোৎস্নায় ঝিমঝিম করছে। মনে হচ্ছিল, এমন জ্যোৎস্না আর দেখিনি, দেখব না।

'বিসর্জনের সময় কোথা থেকে ছুটে এসে তোমাদের ওই আরতির কি বলে তাপ না ভাপ—আগুনের সেঁক লাগিয়ে দিলে।'

'ওটা নিতে হয়, সকলে নিচ্ছিল দেখলে না। ওতে ভাল হয়।'

'ভাল হয় না কলা হয়। মাঝের থেকে সকলে দেখল তুমি—'

'দেখুক।'

'তুমি কতটা শান্তিজল মাথায় ঢেলেছ ?' তরল গলায় বললাম।

'ঢালব কেন, ছিটেফোঁটা যা পেয়েছি তাই।'

'আমার মাথায় তোমার শিবঠাকুরের ঘটিটাই ত উপুড় করে দিলে।'

'ভাগ···মিথ্যে কথা বল না।' মল্লিকা বালির ঢিবির পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে দূরে পুকুরটার দিকে তাকাল একবার। এই পুকুরে ঠাকুর বিসর্জন হয়ে গেছে মাত্র কয়েকঘন্টা আগে। এখনও বোধ হয় সব মাটি গলে যায় নি। 'তুমি শান্তিজলের সময় পালিয়েছিলে কেন, দু-ফোঁটাতেই হয়ে যেত।'

'এ-সব আমার ভাল লাগে না।'

'কি, এই আরতির তাপ, শান্তিজল, প্রণাম···'

'প্রণামটা বাদে।' মল্লিকার দিকে তাকালাম, হালকা নীল রঙের শাড়িটা চাঁদের আলোয় ধোয়া ধোয়া দেখাচ্ছে। মল্লিকার মুখে যেন প্রতিমার মুখের মতন ঘাম তেল মাখানো। জ্যোৎস্নার নরম মিহি মায়া। 'আজকের দিনটা চিরকাল মনে রাখব।' ঈষৎ লঘু সুরেই বুঝি বলতে চেয়েছিলাম, কিন্তু অন্যরকম শোনাল, গভীর ঘন নিবিড় কথার মতন।

'তুমি বড়, তোমায় প্রণাম করতে দোষ কি!' মল্লিকা আরও কাছে সরে এল।

'এতদিন ত করো নি।' কৌতুকের চোখে মল্লিকার দিকে তাকালাম।

কথার জবাব দিল না মল্লিকা। কতক ভাঙা ইঁটের স্তূপ কাটিয়ে আমরা বালি-বালি মেঠো পথ দিয়ে হাঁটতে লাগলাম। দূরে কোথায় একটা বুনো পাখি ডেকে উঠল, থামল, আবার ডাকল।

'এতদিন দরকার হয় নি।' মল্লিকা আচমকা বলল। আমি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম কোন কথার জবাব দিচ্ছে ও। তাকালাম, মল্লিকা সোজাসুজি চেয়ে আছে, মাঠ গাছ ক্ষেত আর জ্যোৎস্না-ধারার দিকে। আচ্ছন্ন বিষণ্ন স্বরে বলল, 'ভাবতাম একদিন ত প্রণাম করতেই পারব, তাই আর···'

কথা যেন মাঝপথে থেমে গেল। আমি অধৈর্য হয়ে উঠেছিলাম বুঝি। দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। চেতনার সরোবরে আচমকা

কেমন একটা ঢিল পড়ে যেন কাঁপন উঠল, ভাঙল, বাড়ল, আরও বাড়ল। হাতের আঙুল আড়ষ্ট, গলা শুকিয়ে যাচ্ছে মনে হচ্ছিল।

'আর পারবে না?' গলা যেন সিসের ডেলার মতন ভারী হয়ে এসেছিল আমার।

'না।'

'কেন?'

'জানি না।'

মল্লিকা মুঠোয় আঁচলের আগা তুলে নিল। দলা পাকালো। মুখের কাছে আনল!···আমরা পা-পা করে হাঁটছি। মনে হচ্ছে, এই হাঁটা যেন কত—কত আগে শুরু হয়েছে।

'মল্লিকা!'

মল্লিকা ঘুমের মধ্যে ক্লান্তির শব্দের মত শব্দ করল একটু।

'আমি···আমায়···মানে, আমি যদি কিছু···' গলার কাছটা থর থর করে কাঁপছিল আমার, বাতাস যেন জমে জমে তুলোর মত পাকিয়ে গেছে, কথা আসছিল না, ফুটছিল না।

মল্লিকা আমার হাত ধরে ফেলল। এমন করে সে কোনোদিন আমার হাত ধরে নি। এ হাতের ভাষা আলাদা, আমি যেন ঙ্গে সঙ্গে সর্বশরীরে চেতনায় তা অনুভব করলাম। তার হাত কাঁপছে, উষ্ণ—ভীষণ উষ্ণ, তার হাতের মুঠোয় যেন আমার বোধ বুদ্ধি অনুভব সব সে আঁকড়ে ধরল। 'কি চাও তুমি আমার কাছে?'

কি চাই! মল্লিকা, আমি কেমন করে বলব আমি কি চাই! তোমার ভালবাসা, তোমার ভালবাসা। তুমি আমায় ভালবাস মল্লিকা।···মনে হল যেন এই মাঠ গাছ আলো সব কিছু চমকে দিয়ে আমি এই দীর্ঘদিনের সযত্নে লালিত ঐশ্বর্যময় কথাটা বলে ফেলেছি। কিন্তু না, আমি কিছু বলি নি, সব শান্ত নিস্তব্ধ নিবিড়

হয়ে আছে। আর আমি মল্লিকার হাতে আরও গভীর করে নিজেকে সমর্পণ করেছি।

'তুমি আমায় যা দেবে'···আস্তে আস্তে ভাঙ্গা গলায় বুঝি বললাম আমি।

'যা দেব!' কী কষ্টে যন্ত্রণায় হতাশায় অস্পষ্ট প্রায় অশ্রুত গলায় ও বলল। দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলল। নীরবে কয়েক পা হেঁটে এল। 'আমার আর কিছু দেবার নেই।···তুমি অনেক অ—নেক দেরিতে চাইলে।'

মল্লিকার গলার স্বর কাঁপছিল। উচ্ছ্বাসে বেদনায় উপচে উঠেছিল। হয়ত কাঁদছিল ও। 'আমায় ওরা দেখে গেছে—কলকাতার বাড়িতে ···' একটু থামল মল্লিকা, গলার স্বর যেন আয়ত্ত করার চেষ্টা করল, 'সেই যে সেদিন, যেদিন তুমি আস নি।'

পায়ের তলায় মাটির স্পর্শ আর ছিল না। চোখ ঝাপসা হয়ে এসেছিল আমার। মনে হচ্ছিল, আমি যেন বাতাসে কুটোর মতন ভাসছি, কিংবা স্বপ্নে কোন জলের ঢেউয়ে ঢেউয়ে চলেছি।

'আমি ভেবেছিলাম সে-দিন তুমি থাকলে বুঝতে পারতে—আমার অপেক্ষা করার সময় আর নেই।' মল্লিকা যেন স্টেশন ছেড়ে অনেকটা দূরে গিয়ে এঞ্জিনের হুইসলের মতন দূরান্তে শেষ বিদায়টুকু জানিয়ে দিল।

আরও একটু পথ আমরা হেঁটে এলাম, নীরবে নিবিড়ে অথচ বিচ্ছিন্ন মনে।

'মল্লিকা।'

'বলো।'

'আমায় তুমি আর একটু সময় দাও।'

'সময় দেবার মালিক কি আমি! আমার মাথার ওপর বাবা মা—' ঠোঁট কামড়ে ধরে কান্নার আবেগ থামাবার চেষ্টা করছিল মল্লিকা। 'সময় নিয়ে কি করবে তুমি?'

আমি জানতাম না আমি কি করব। যখন সময় চেয়েছিলাম, মনে হয়েছিল, সময়ের কাছে যেন আমার আলাদীনের প্রদীপ জমা আছে, হাত বাড়ালেই পেয়ে যাব। মল্লিকার কথার পর মনে হল সময়ের কথাটা ফাঁপা ফাঁকা।

'বলো।'

'কি?'

'আরও সময় পেলে কি করবে তুমি?'

'একটা কিছু করব।' বেহুঁশ ঘোরের মধ্যে কথাটা বলেছিলাম। কিছুই আমার কাছে নিশ্চিত নির্ধারিত ছিল না।

অল্পক্ষণ নীরবে কাটল। এখানে কোথায় যেন ঝিঁঝি ডাকছে। মল্লিকা সামান্য কাশল। আমার শীত-শীত করছিল।

'এতদিন কেন কিছু করলে না…!' মল্লিকার হাত শীতল হয়ে গেছে। আমার হাতে ক্রমশ সেই শীতলতা আমাকে শিথিল করছিল। তার আক্ষেপ হতাশা বেদনা আমায় যেন লজ্জায় অসম্মানে আরও হতাশ করল, ধিক্কার দিল।

মল্লিকা, আমি কিছুই পারব না। কিছু না। তোমায় শুধু বৃথা আশ্বাস দিচ্ছি, তোমায় আমি আরও কিছুকাল এই মোহে অন্ধ রাখার চেষ্টা করছি। সময় আমায় রাজা করতে পারবে না, সময় আমায় আলাদীনের প্রদীপ হাতে তুলে দেবে না। তুমি কি বোঝ না, আমরা সমুদ্রে সাঁতার কাটার খেলা খেলছি। আমরা বোকা, আমরা ছেলেমানুষের মতন এই মনের খেলা খেললাম। আমি অযথা তোমায় ভবিষ্যতের ভরসা দিয়ে ধরে রাখার চেষ্টা করছি মল্লিকা। আমাদের ভবিষ্যত নেই, থাকে না। কি হবে সময়ে? পাঁচ বছর পরেও তুমি দেখবে, এই আমি ঠিক এই রকম আছি—দরিদ্র দীন; প্রত্যহের কলঙ্কে মালিন্যে মলিন; সংসারের ইঁদুর-কলে আটকে-পড়া জীব।…আর তুমি, তুমি আমায় কোন আশ্বাসে বার বার সময় দেবে মল্লিকা। তোমার

সময়ের মালিক তুমি নও। হয়ত তুমি আমি আমরা কেউই কোনো কিছুর মালিক নই।

'তুমি কবে ফিরছ ?' মল্লিকা শুধলো।

'পরশু।'

'আমি এখন কলকাতায় যাচ্ছি না। মা-রা বোধ হয় কালী-পুজোর পর যাবে।'

'তুমি ?'

'শীতের শেষে।'

শীতের শেষে বসন্তে তুমি হয়ত যাবে। কিন্তু আমাদের—তোমার-আমার পালা বসন্তে নয়, শরতে। সে-শরৎ শীতের আগেই ফুরিয়ে যায়।

মল্লিকার ঠাণ্ডা হাতের স্পর্শ থেকে আমার আঙুল একটি একটি করে শিথিল হল। মনে হল, এর পর আর কিছু নেই। এই বিচ্ছিন্নতাই সমাপ্তি। যদিও, আমরা আজও ছেলেমানুষের মতন পরস্পরকে আরও কিছুর আশা দিয়ে রাখছি, কারণ এই ফাঁকা আলোভরা মাঠে এত নিবিড়তায় নিস্তব্ধতায় একে অন্যের ঐশ্বরিক স্পর্শের মধ্যে আর কি বা দিতে পারি।

দ্বিতীয় পর্ব

লেখকের অন্যান্য বই :

[illegible]

খোয়াই

সুধাময়

অপরাহ্ন

কথাকলির অন্যান্য বই :

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্যের
তারার আঁধার—৩.৫০

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের
কস্তুরী মৃগ—৪.০০

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
বৈশালীর দিন—৩.২৫

বারীন্দ্রনাথ দাশের
ভুলারীবাঈ—৪.০০

আশাপূর্ণা দেবীর
উত্তরলিপি—৪.৫০

সন্তোষকুমার দে-র
রক্তগোলাপ—৩.০০